কবিতার ভাষা

কবিতার ভাষা

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

কবিতার ভাষা
আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ
রচনাকাল: ২০১০-২০১৫

স্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৬

প্রকাশক
মো. জাহিদুল হক চৌধুরী রাজীব
চৈতন্য
কানিজ প্লাজা (৩য় তলা), জিন্দাবাজার, সিলেট
rajibchowdhury92@gmail.com
০১৭ ১৮২৮ ৪৮৫৯

মুদ্রণ : শব্দমারা অফসেট প্রেস
প্রচ্ছদ : তৌহিন হাসান
অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com

টাকা :

Kobitar Bhasha
A collection of Bengali essays by Abu Sayeed Obaidullah
First Published in February Book Fair 2016
Published by CHAITANYA prokashon, Sylhet
Tk. 0, Rs.
ISBN: 978-984-9204

উৎসর্গ

যে তুমি নতুন কবিতার পথে

সূ। চি। প। ত্র

এক পাতার সিঁড়ি : মৃত(আধুনিক) কবিতা ০০
এক পাতার সিঁড়ি : না-ভাষার কবিতা ০০
আমি যেমন আমার নই, সে অর্থে কবিতা আমার ভাষার কিছু নয় ০০
কবিতার ভাষা ০০
কবিতার শত্রু ০০
হাইডেগারের চিন্তাজগৎ : কবিতা কিভাবে সৃষ্টির দরোজা উন্মোচন করে? ০০
আহা বিদেশি বাতাস ০০
প্লেটো–কবিতার ভিলেন ০০
মুক্তপাঠ : লালন ফকিরের ‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি’ আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে আছ’ ০০
হোর্হে লুইস বোর্হেসের একটি কবিতা পাঠ ০০
সময়ের বাইরে কবিতার ভেতরে ০০
সংঘের রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করে কবি রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায় ০০
কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন স্মরণে রচিত : এক আত্মবিশ্বাসি দ্রষ্টা-কবি ০০
পাঠকের কবিতা বিচার ০০
একটি কবিতা পাঠ : রবার্ট হাসের-হিরোয়িক সিমিলি ০০
আমার রবীন্দ্রশূন্যতা, কবিতাপাঠ সংকট ০০
বাঙালি(কবির) মন ০০
পলাশী ও পানিপথ : কবিতার আলো নাকি থোকা থোকা রক্তজবা ০০
কবিতা ও দুর্বৃত্তপনা ০০
কবির নিজের বাড়ি বা নতুন কবিতার পথ০০
কবিতার দায়বদ্ধতা ০০
ফেসবুক ভিত্তিক কবিতার পাতা ’ঘুমঘোর কবিতার ক্যাফে’ এর সাথে আমার একটি সাক্ষাৎকার ০০

এক পাতার সিঁড়ি : মৃত(আধুনিক) কবিতা

আধুনিক কবিতা বিশ্বাস হারানো মানুষের কবিতা। যেন ফ্রয়েড কথিত মানসিক প্রতিবন্ধীদের চোখে দেখা এক বিকলাঙ্গ পৃথিবী। পাপাচার, যৌনাচার, ব্যাভিচার, পরকিয়া, মদ্যপান ইত্যাদির মতো সুস্বাদু নেশা ও নিশা যার অনিঃশ্বেষ চারণভূমি। এখানে কবিদের পরিপ্রেক্ষিত বন্ধ্যা, দুঃখদুষ্টে ক্লিন্ন, কষ্ট জর্জর, স্বমেহনের মতো আত্মক্ষয়ী রুগ্নতা আর গ্লানিতে পূর্ণ। আধুনিক কবিরা এমন এক অসুখে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছেন যেখানে শয়তান যেতেও ভয় পায়। ক্ষণিক নরকস্তন চুষে যা সুখ পাওয়া যায় তা মেকি, ভঙ্গুর আর সদা নিরাশায় দোদূল্যমান।

আধুনিক কবিতা না বুঝতে চেয়েছে মানুষের শুদ্ধতা, না স্পর্শ করতে পেরেছে আরশি নগর আর তার পড়শির পরমতা। সে থাকতে চেয়েছে উঁচুতে থাকা ঐ মেঘের মতো নিঃসীম একা, আপনার ছায়াঘরে বিষাদবন্দি। তাই স্বভাবতই আধুনিক কবিতা একপেশে, করুণ রুগ্ন। এর কবি নার্সিসাস বোধে এত আত্মমগ্ন যে কবিতার নির্মাতা আর নির্মাণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যায় না। এই ক্ষুদ্র পরিধিজুড়ে সে যা ভাবছে, বা যা করছে তাই যেন কবিতার অনায়াস বয়ন, কবি আর কবিতার এ যেন অনিবার্য নিয়তি। কবি এক বিশ্বাসহীন, নাস্তিময়, জ্বরাক্লিষ্ট পৃথিবীর সাক্ষী; তার কবিতাও সৃষ্টিতে খর্বকায়, রুগ্ন। পৃথিবীর দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ধ্বংস করে দিয়েছিল। মানুষের শুভবোধ, খোদা-ধারণা থেকে মানুষকে তাড়িয়ে ক্রমশ নিমজ্জিত করেছে এক মধুর নরককুঞ্জে। যুদ্ধের করুণ স্মৃতি আর তার গলিত শব বিনির্মাণ করার দায় পড়ল আধুনিক শিল্প সাহিত্যের রচিয়তার ঘাড়ে। এ রকম চলল পুরো শতাব্দি ধরে। সেই আত্মস্বীকৃত বৈনাশিক চিন্তা থেকে বের হয়ে আসল কত অগুণতি তত্ত্ব ও তথ্যের কীট আর কীট। এই আত্মক্ষয়ী, মরবিড কবিতার শেকড় বাকড় ডালপালা ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর সকল দেশে। কবিতায় বোদলেয়ার, পাউণ্ড, এলিয়ট, উপন্যাসে জয়েস, কনরাড, ফকনার, কাফকা, কামু; দর্শনে নিৎটসে, সাত্রে যা শুরু করেছিল তার হাত ধরে পৃথিবীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল এই রুগ্নবার্তা- আধুনিক হও, অদৃশ্যে বিশ্বাস করো না, নাস্তিবাদি হও। আমাদের বাংলাদেশও তার অন্ধকার থেকে বাদ পড়েনি। এ যেন হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা। এক মায়াবি সুরে ডেকে নিয়ে গেল সবাইকে- এক 'পড়ো জমি'র গন্তব্যহীন ধ্বংস-জগতে। কী করুণ অপচয়- মানুষের শক্তির আর সম্ভাবনার।

আধুনিক মানুষের অবিশ্বাস, চিন্তা, দর্শন, অর্থব্যবস্থা, রাষ্ট্র কাঠামো, রাজনৈতিক বিশ্বাস কিছু মানুষকে করে তুললো নরকের নিপীড়ক আর কিছুকে করে তুললো সদা সন্দেহপ্রবণ, সদা পলায়নপর, পাগলপ্রায়, আশ্রয়হীন কুকুরসম প্রাণীতে। এই আধুনিক মানুষ সৃষ্ট ব্যবস্থা আজো পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে কোনো শান্তি, সাম্য ও ন্যায় বিচার কায়েম করতে পারেনি। যে পুঁজিবাদি শিল্প কারখানা নির্ভর, বস্তুবাদি আর্থ-সামাজিকতা আধুনিক কালের চূড়ায় উঠছে, তাতেও গণ মানুষের মুক্তি মেলেনি। মানুষ দাস থেকে দাসতর হয়েছে, নারী হয়েছে কর্পোরেট ভোগবাদি, আলো ঝলমলে ডল হাউজের পরাধীন পুতুল। অত্যাধুনিক ফ্যাশনের প্রয়োগক্ষেত্র- সে নিজেকে ভাবে স্বাধীন, ক্লাব আর উৎসবে নেচে গেয়ে মনে করে আত্মনির্ভর, বেঁচে যাওয়া। আহা সে জানেনা মুনাফাখোর, মজামুখি এই বাজারসমাজ তাদেরকে আত্মনির্ভিরতার ডোজ দিয়ে রুগ্ন আর নগ্ন করে ছেড়ে দিয়েছে ক্ষুর্ধাত কাপালিকদের কাছে!

তো যে নেতি আর মনোবৈকল্যর উপর দাঁড়িয়ে আধুনিক কবিতার জন্ম তাকে আর পড়া যায় না। তাদের স্বমেহন, মেকি দুঃখকাতরতা, আত্মরতির রুগ্ন কবিতাগুলো আজ যেন মরা মানুষের দেহের গন্ধ বয়ে আনে। এখানে নেই কোনো চলমানতা, নেই কোনো নতুন, নেই কোনো সৃষ্টি। আধুনিক কবিতা নিজেই আটকে গেছে তার শবদেহে। তার ভূগোল সংক্ষিপ্ত, তার পরিধি ক্ষুদ্র তার চিন্তা শৃঙ্খলিত। তাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে হাতে গুণা কয়েক গুচ্ছ মৃত শব্দ। যেখানে আছে দুর্গন্ধ, আর ভন ভন করে ঘুরে বেড়ায় হাজার হাজার বিষাক্ত শব্দমাছি।

ভাগ্য ভালো যে সময় বয়ে চলে নিরবধি। মানুষ আজ টের পেয়েছে এই আধুনিকতার চোরাগুপ্তা অসারতা, তার মৃত্যুমুখর বেঁচে থাকাকে। তাই মানুষ তার হারানো আত্মপরিচয় উন্মোচন করে, তার নিজ সত্তার কাছে প্রশ্ন রাখে, উত্তর খুঁজে পরমের কাছে। সে স্বভাবতই পরিধি অতিক্রমকারি, ক্রমশ খুঁজে বেড়ায় তার অস্তিত্বের অর্থময়তা, খুঁজে বেড়ায় হারানো 'যোগাযোগ'কে। প্রশ্নের স্তরায়নে, আত্মিক শুদ্ধির অনুপ্রেরণা পায় তার অস্তিত্বের ভেতরে লুকিয়ে থাকা এক মহা অধরা, অজানাকে। ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব খুঁজে পায় ইতিহাস ঐতিহ্যে, সংস্কৃতির যৌথ দোলাচলে। মানুষ বুঝতে পারে সে একা নয়, সে এক বিশাল কৌমের অধীন। আর তার আছে অধিকার আর অঙ্গীকার, তার আছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ। তাই তো আধুনিক-পরবর্তী যূথবদ্ধতা, মানুষের জ্ঞান-গভীরতা, আর দেহ আর মনকে চেনা জানা সূত্রের বাইরে হারিয়ে যাওয়া 'যোগাযোগ'

নিবেদনে বোঝা শুরু হলে, কবিতার অজস্র জানালা খুলে যায়। ব্যক্তি তার খোলস ভেঙ্গে চলে আসে আরো ব্যক্তির কাছে, তার নিজের প্রকৃত পরিচয়ের কাছে। সে বুঝতে পারে এই বিশ্বে সে আর কিছু নয় সে এক অনন্য সৃষ্টি, এক অনন্তের সাথে মিলনের উদ্দেশে সে হাত ধরে এগুচ্ছে। তাই কবিতার মায়াবি পর্দা দুলে ওঠে, যোগাযোগের এনকোড আর ডিকোড খুলে যায়, তার অদেখার সাথে একত্রিত হওয়ার লোভ এই বিশ্ব চরাচরকে করে তোলে সদা চলমান, গঠনশীল এক 'হয়ে ওঠা'।

২৪/০৪/২০১৫

এক পাতার সিঁড়িঃ না-ভাষার কবিতা

ভাষা যেমন কবিতার বাহন তেমনি ভাষা কবিতার ভারও। আমরা যা ভাবি বা যা তৈরি করতে চাই তা একটি ভাষার আবহে রাখি। কিন্তু কখনো চিন্তা করি না যে ভাষা সব কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। কবিতা তো নই। আমরা হাজার বছর ধরে যা ভেবে আসছি তা কেবলই একটি তৈরি ভাষার ছাঁচে লেখা। হাজার বছর ধরে থাকা এই কাঠামোটি আমাদের পাঠে, আমাদের মানসে, আমাদের স্মৃতিতে এমনভাবে শেকড় গেড়ে বসে আছে যে এর বিকল্প আমরা চিন্তাও করতে পারি না। কবিতা ঠিক আমাদের এই ভাষায় জন্ম নেয় না। আমরা আমাদের অজান্তে, প্রায় জোর করে আমাদের এই জনশ্রুত, জননন্দিত ভাষায় ভাবনাকে সাজিয়ে তুলি। কবির কাজ এই ভাষায় থেকেই কবিতাকে আর একটি ভাষায় রচনা করা। কারণ হিসাবে বলা যায় কবিতা প্রথম জন্মকালে এই প্রতিষ্ঠিত ভাষায় আমাদের মনে উদয় হয় না। আমরা অভ্যাসবশত এই 'পাওয়া' ভাষায় কবিতাতে সাজাতে চাই। তাই কবিতা হয়ে পড়ে পাঠ্য পুস্তকের পড়ার ভাষা, কিছু পরিচিত ভাবনা আর সুন্দর সুন্দর শব্দের খেলা। এতে কবিতাকে কেউ জনবচ্ছিন্ন হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ার বিষয়টি চিন্তা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের মেনে নিতে হবে কবিতা আসলেই একটি ছদ্ম, প্রায় জনবিচ্ছিন্ন কাজ। কবিতা একটা জনগোষ্ঠীর অন্তকরণে ধরা থাকলেও তা আসলে একটা আলগা, পৃথক রচনাশিল্প। কবিতার কাজ জনসন্তুষ্টিকরণ নয়, জনসন্তুষ্টি হলো গল্প, উপন্যাস ও খবরের কাগজের কাজ।

কবিতার গঠন আমাদের প্রাত্যহিক ভাষার সরল রৈখিক, ব্যাকরণ ভিত্তিক সভ্যতা ও পরম্পরা ধরে ঠিক আগায় না। যারা কবিতাকে আবহমান, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মোড়কে সাজিয়ে তুলতে চান তারা আর যাই কিছু করে না কেন কবিতাকে যে মোটেই খুঁজে দেখে না- তা ভাবা যায়। এটি একটি বিপদজনক অবস্থা। সত্যিকারের কবিতা এই ভাষাকে লুকিয়ে রেখে নিজের প্রাণের অস্তিত্বকে জানান দেয় বলে- এটি প্রায় না-ভাষায় ধরা একটা মানসিক অবস্থা। তো একজন কবি এই ঝুঁকি নেবেন কিভাবে? আমার যা ভাবনা তা সবার ভাবনা নয়। তো এখন আমি কি করে আমার ভাবনাটা সবার করে তুলবো? এটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয় যখন কবি সবার কথা চিন্তা করে সেই আবহমান ভাষায় কবিতাকে সাজিয়ে তুলতে চান। মনে রাখতে হবে যে কবিতাকে সাজিয়ে তোলার প্রয়োজনেই আমরা ভারবাহি, গুণহীন, অচল ভাষার কাছে চলে আসি। যখন এই সাজিয়ে তোলা থেকে দূরে থাকি তখনই কবিতা নিজেকে রচনা করে ফেলে।

এটি একটি পতিত জমির মতোই। আমরা এটিকে ব্যবহার করি আর না করি না কেন, এটি নিজে নিজে ফলমূল নিয়ে জন্মাবেই। তো একজন কবিতা লেখক এই না-ভাষায় কবিতাকে কিভাবে মূর্ত করে তুলবেন? প্রথমে আমাদের বোধ দিয়ে আমাদের মনের বাজনাটিকে শুনতে হবে। এটি যে কোনো কারণেই বেজে উঠতে পারে। দ্বিতীয়ত আমার ভেতর 'হয়ে' থাকা ভাষার পর্দা সরিয়ে আমার সেই কবিতার ভাষাই কবিতাটিকে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে আমার চোখের সামনে কোনো পাঠক দাঁড়িয়ে নেই। যে আছে সে তো শুধু আমার ভাবনাটি আর আমার কবিতার ভাষা। আমি যদি সমুদ্রভ্রমণ নিয়ে একাট কবিতা লিখতে চাই তাহলে প্রথমেই আমাকে সেই 'সমুদ্র' থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। কারণ সমুদ্র বিষয়ক ভাষা আমার আগেই কোথাও না কোথাও তৈরি হয়ে আছে। সমুদ্রভ্রমণ একটি সত্য অভিজ্ঞতা কিন্তু কবিতা ঠিক সেই সত্য সমুদ্র-অভিজ্ঞতা নয়। যদি সরাসরি এই সমুদ্রভ্রমণ নিয়ে আমি কবিতা লিখতে চাই তাহলে এটি আমাদের প্রতিদিনের ভাষা আর নিত্য ভূ-বাস্তবতার অচল অংশ হয়ে পড়বে। তাই যখনই আমার চিন্তায় সেই 'সমুদ্র' আর থাকছে না তখনই আমার কবিতা আর একটি নতুন সমুদ্রভাষা নিয়ে জেগে উঠবে। সমুদ্রভ্রমণ একটি ঘটনা কিন্তু কবিতা সেই ঘঠনা থেকে মুক্তি। তাই আমার লিখিত কবিতাটি আর আমার প্রথম দেখা সমুদ্র বিষয়ক কবিতা হয়ে উঠবে না। এটি হয়ে উঠবে আমার চিন্তার দ্বিতীয় সমুদ্রলেখা, যেখানে সমুদ্র ধীরে ধীরে বেজে ওঠা একটি ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক মাত্র। সেই সূত্রে বলা যায় কবিতা আর একটি ভাষায় লিখিত হয় বলেই এটির সাথে আমার একটি অনিঃশ্বেষ ভ্রমণ ঘটে আর পাঠকের চোখকে আর একটি চোখ দিয়ে দেখার প্ররোচনা দেয়।

সৃষ্টিহীন কবি কবিতার ন্যারেটিভিটি পছন্দ করেন। পছন্দ করেন সরাসরি পাওয়া অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যা, বিবরণ। কবিতাকে আমাদের পাওয়া ভাষায় লেখার প্রয়োজনীয়তা থেকেই কবিতার ন্যারেটিভিটি কাজ করে। কারণ এটি বেশ সহজ একটি প্রক্রিয়া। এইসব কবিতায় স্বাভাবিক ভাবেই পুরনো শব্দ, পুরোনো ম্যাকআপ কবিতাকে অলঙ্কারসমৃদ্ধ ও ভারি করে তোলে। কিন্তু কবির কাজ কবিতাকে ভারহীন করে তোলা, একে শব্দ-উত্তীর্ণ, একে ভাষা-উত্তীর্ণ করা। আমরা যদি আমাদের অভিজ্ঞতাকে, আমাদের জ্ঞানকে, চারিদিকে ছাড়ানো ছিটানো বস্তুর গুণকে এর প্রাতিষ্ঠানিকতা দিয়ে চিন্তা করি তাহলে আমাদের উপলব্ধি সেই প্রাথমিক স্তরেই থেকে যায়। এতে করে আমাদের বোধের কোনো ডাইমেনশন ঘটে না। আবহমানের কবিতা এমনই হবে। আর যখন এই অভিজ্ঞতাকে, বস্তুজ্ঞানকে এর তৈরি গুণের বাইরে চিন্তা করি তাহলে শব্দ শব্দ-

উত্তীর্ণ, ভাষা ভাষা-উত্তীর্ণ হবে। যেমন ছুটে চলা পাখির উড়ালকে আমরা আমাদের তেরি ভাষায় সাজাতে চাইলে আমরা নিটোল নেরেটিভিটির আশ্রয় নেবো। আমরা আকাশ, পাখি, পাখির ডানা, দূরের প্রিয়জন এইসব আমার অভিজ্ঞতালব্ধ ভাষার ছাঁচে কবিতাটাকে লিখতে সচেষ্ট হবো। এই প্রাণহীন, ক্লিশে অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে এই দৃশ্যটিকে আমরা যদি আর একটি নতুন ভাষায় লিখতে চাই তাহলে আমাদের দেখা আর ভাবার ভিতটিকেও বদলে ফেলতে হবে। ভাষা চিন্তার অনুগামী, তাই এই পাখির এই দলবদ্ধ উড়ালকে আমরা যদি ভিন্ন ডাইমেনশনে চিন্তা করি তাহলে এই ন্যারেটিভিটি বদলে যাবে, ভাষাও বদলে যাবে। আমাদের চিন্তা করার পদ্ধতি আর ভাষার মায়া উভয়ই আমাদের এই রকম ভাবতে বাধা দেয়। তাই প্রথমেই এই প্রতিষ্ঠিত চিন্তাপদ্ধতি আর ভাষার গঠন থেকে নতুন কবিকে বেরিয়ে আসতে হবে।

১৪/০৪/২০১৫

এক পাতার সিঁড়ি : আমি যেমন আমার নই, সে অর্থে কবিতা আমার ভাষার কিছু নয়

কবিতা রচনা যে একটা হাতের কাজ নয় তা সত্য হয় যদি আমরা ভাষার বাইরে গিয়ে দাঁড়াই। হাতের কাজ একটা টুল, একটা শারীরিক সঞ্চালনমাত্র। কবিতা নব্বই ভাগই মনোজাগতিক, দশ ভাগ হাতকারুপণ্যগিরি হতে পারে। এখানে হাতের কাজ ততটুকু, যতটুকু শুধু একটা কাঠামো দাঁড় করার জন্য প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু একটা আকস্মিক হাজির/নাজিল না থাকলে বা নিদেনপক্ষে একটা অনুপ্রেরণা না ঘঠলে কাঠামোটি শুরু হবে কি করে? আর হাতের কাজ সবসময়ই জৈবপ্রধান, অতএব সীমাবদ্ধ। কবিতায় যখন হাতের কাজের কথা বলা হয় তখন একথাই জানানো হয় যে এখানে কৌশল জানতে হয়, শব্দ ও ভাষার যা হয়ে আছে তার গোলামি করতে হয়। এ কথার সূত্র ধরে বলা যায়- শিল্পকলা, রচনা কৌশল, কারুপণ্যগিরি এসব জানলেই যদি কবিতা লেখা যেত তাহলে এসবের লেখকেরাই কবি হয়ে উঠত! অলিতে গলিতে কবিতার স্কুল দেখা যেত। তাহলে একটি কবিতার জন্ম হয় কিভাবে? উত্তরে হয়ত অনেকেই বলবেন- এটি ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিষয়, কবিবিশেষে এটির এক এক জন্ম। কিন্তু সবাই যে কথাটি এক বাক্য স্বীকার করবেন তাহলো কবিতা আসে, কবিতা হয় না। তার মানে যে এটি একটি 'পাওয়া' বিশেষ। আমাদের চারপাশে কবিতা সৃষ্টি হয়ে আছে। সবাই তো আর এ জিনিসটি ধরতে পারেন না বা আল্লাহ সবাইকে সেটিকে ধরার শক্তি দেয় না। যারা এই শক্তি পায় তারা টের পায়- একটা কিছু মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে হাজির হয়।

প্রশ্ন হলো কী আসে? কিভাবে আসে?। বিষয়টি জটিল কারণ আমরা কোনো কিছুই দেখতে পাই না। তাই এর কোনো একরৈখিক উত্তর নাই। যেমন গাছকে আপনি যদি প্রশ্ন করেন তুমি পাতা দাও কেমনে? ফলমূল দাও কেমনে? গাছ তো আর কথা বলতে পারবে না। এ তার পাতা আসা বা ফলমূল আসার কাথাটি বলতে পারবে না। কারণ গাছ আর একটি মহাশক্তির বার্তাবাহক, পরিবাহক শুধু। বিষয়টি মায়ের পেটে বাচ্চা আসার মতো। আমি আপনি চাইলেই তো কোনো নারীর পেটে বাচ্চা দিতে পারবো না বা নারীটি চাইলেই তো বাচ্চা আসবে না। এমনকি বিবাহিত নারী হলেও। এটি আসতে হবে! কোথাও না কোথাও এটি হয়ে আছে। সেখান থেকে এটিকে আসতে হবে। তাহলেই তো গর্ভজাত হবে, সন্তান প্রসব হবে। কবিতার সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি এভাবে চিন্তা করা যায়। কারণ শব্দ দিয়ে কবিতা হয় না, বাক্য দিয়ে কবিতা হয় না, গল্প, নাটক,

রাজা বাদশা, উজির নাজির, প্রেম ভালোবাসা বা নারীর সৌন্দর্য ইত্যাদি দিয়ে কবিতা হয় না। এগুলো কেবলই সলিড জৈব পৃথিবী। এর আরো একটি জিনিসের প্রয়োজন পড়ে যার নাম সারেণ্ডার বা নিষ্কৃতি। আমার 'আমি'র নিষ্কৃতি। নিজের বদ্ধ চিন্তাভাবনা থেকে বের হয়ে আর একটি সদা স্বয়ং প্রকাশের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া। তাতেই ভাষা নামক এই শরীরী পূজা থেকে আমাদের চিন্তার মুক্তি ঘটে আর কবিতা হাজির হয়। আমাদের বুঝতে হবে যে ভাষা একটি জড় সংঘঠন মাত্র যা মানুষের সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়া এক পাও চলে না। কিন্তু এটিতে মানুষের টোটাল অহং এর নিষ্কৃতি না মিললে এটি আমাদের একটি পূজায় পরিণত হয়- কলাকৌশলের পূজা । তখন আমাদের ভাবনার 'আমি'র মুক্তি মিলবে না, কবিতারও দেখা মিলবে না।

আজকের কবিতা যতক্ষণ এই ভাষাপূজার বলয় থেকে বের হয়ে এই সদা স্বয়ং প্রকাশ ফেমেননের পোশাক পড়বে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কবিতা আসবে না। যে কবি যত বেশি এই ভাষা পূজাকে ধাক্কা দিতে পারেন সে ততই জীবন্ত কবিতার সন্ধান পান। পৃথিবীর বড় বড় কবিদের কথা ভেবে দেখেন। তারা প্রতিষ্ঠিত কাব্যভাষা তথা ভাষাপুজার বলয়টিকে ভেঙ্গে দিয়ে তাদের নিষ্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এটি সবারই আসে না। এই জন্যই যুগে যুগে বড় কবির জন্ম হয় না। নতুন কবি তার এই ভাষার পূজনীয়তাকে, এই সৃষ্টিহীনতার লোভনীয় পরিধিকে অতিক্রম করেন। সে তার চারদিকের স্বয়ং-প্রকাশকে তার জ্ঞান অভিজ্ঞান তার চেতনা অবচেতনা, তার রক্তের সাথে মিলিয়ে নেন। ভাষা তখনই আর গোলাম পায় না, পায় কানেকটেড কাউকে, যে কিনা সেই স্বয়ং-প্রকাশকেই প্রকাশ করেন। তার ইচ্ছার সাথে নিজের হওয়াকে মিলিয়ে নেন। আর এটি তখনই সম্ভব হয় যখন কবিতা-লেখক তার ভাষা অহংকে ছেড়ে তার চারিদেকে ছড়ানো পরমকে টের পান। এই পাওয়া হয়ত সহজ নয়। আমাদের চারদিকে হাজার বছর ধরে ভাষার মূর্তি ঘিরে যে এক সিস্টেমের সৃষ্টি হয়েছে তাতে শুধু অনেক অনেক প্রতিধ্বনিই(ইকো) সৃষ্টি হয়েছে। কবিতা-লেখক আসল সত্তার স্বরুপটি না বোঝেই নকল ইকোর মধ্যে নিজের কবিতা-সাধনকে বিলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সত্য হলো কবিতা লেখক যতক্ষণ না পর্যন্ত এর বাইরে না বেরুতে পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে কবিতা-লেখকই থাকেন, কবি আর হন না। এই অক্ষমতার কারণেই সব সময় ভুরি ভুরি ইকো-কবি থাকে। তারা একটি ভাষাকে ঘিরেই তার সংগ্রহকে দীর্ঘ করেন। তার এই ঘূর্ণনটা যেন স্বেচ্ছায় আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য তৈরি মাছি। দিন শেষে এটি শূন্যই থেকে যায়, কারণ এটি আর কিছু যোগ করে না। এখানে আর কিছুর জন্ম হয় না বা কিছু আসে না। আমার যখন এক পরম

ভাষার কাছে নিজেকে সমর্পিত করতে পারবো তখন সেখানে আমাদের দেখার আর বোঝার আত্মাটির মুক্তি ঘটবে। আর তখনই সবকিছু সম্ভব বলে মনে হবে। কারণ সেই জায়গায় সব কিছুই কানেকটেড, সব কিছুই একটি থেকে আর একটিতে হওয়া।

যারা এইভাবে চিন্তা করেন তারা যে নিজের অহংকে হত্যা করে সেই পরম এককের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন, তার নানান প্রকাশে নিজেকে সাক্ষী করেছেন- এটি নিশ্চিত। তাদের এই অবস্থা বুঝতে হলে আমাদের শতভাগ নৈয়ায়িক হলে চলবে না। কারণ নৈয়ায়িকতা শুধুমাত্র একটি হয়ে থাকা অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করে যার কোনো কালভিত্তিক, প্রামাণিক সত্য নাই। তাই সারেণ্ডারের মাধ্যেমে যখন কবিতা-লেখকের আর একটি বিশেষ চোখের সন্ধান মেলে তখন সেই হয়ে থাকার একটি অংশ হয়ে যান। তখন সে স্বয়ং-প্রকাশের নানা রূপ, বর্ণ গন্ধে আকুল হন আর ঠিক তখনই কবিতা আসে। তখন কবিতাকে শুদ্ধ অ্যালগরিথম দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। একটি বস্তুর থাকা না থাকার অভিজ্ঞতাকে প্রমাণের মধ্যে সেই বস্তুটির থাকার যৌক্তিকতাকে বোঝানো যায় না। বস্তুর থাকা না থাকার আগে আরো একটি থাকা থাকে, যার মাধ্যমে কবির চারদিকে একটা ক্যালিবেরিক যোগাযোগ সৃষ্টি হয়, সে তখন তৃতীয় একটা চোখ পেয়ে যান। সেই চোখ তার নয় ঠিক। এই চোখ আর এক জায়গায় আগেই সৃষ্টি হয়ে আছে। সেই অর্থে আমি যেমন আমার নই, সে অর্থে কবিতা আমার ভাষার নয়। কবিতা ভাষার বাইরে থাকা সদা উপস্থিত 'স্বয়ং-ভাষা'র একটা প্রবাহমান অংশ।

১১/০৬/২০১৫

কবিতার ভাষা

মানুষ কবিতায় কতো কিছু বলতে চায়। সে তার সামাজিক ব্যক্তিপুরুষের অধীনে নিজেকে মেলে দিয়ে হয়ত অনেক কথাই বলে। জন্ম-মৃত্যু, জয়-পরাজয়, যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রেম- বিরহ, হর্ষ-বিষাদ, রক্ত-রাজনীতির কথাকাহিনি কতো কিছুই। এইসব চরম মূহুর্তগুলো লিখে দিলেই হয়ত ঐতিহাসিক মানুষ এক রকম আনন্দ পায়। যা ব্যক্ত, যা প্রচারিত যা সত্য, যা এমনিতেই প্রকাশিত তার রচনা মানুষের কাছে কত আকষর্ণীয় কত আরামদায়ক! কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে যদি একজন কবি হয়- তাহলে সে এইসব ব্যবহৃত মোহন চোরাবালির দিকে চোখ দেয় না বা পা বাড়ায় না। সে এইসব বলা থেকে নির্দয় ঋষিসুলভ, মৌন মানসিকতায় বিরত থাকে। কারণ এইসবে তার কোনো কথা নেই, বলা নেই। তার এই নিষ্কৃতি এক রকমের কবিতা-সংকেত, কবিতার বীজ বহনের অপেক্ষা-ঋতু। এই যে সে ঋষির মতো যে রকম অপেক্ষা করল, সেখানে ধীরে ধীরে শিশুর মতো বড় হতে থাকে এক গোপন পরাক্রান্ত ভাষা। তখন তার এই ভাষাই তাকে পৃথক করে ফেলে। তার সেই ভাষাই তার সব প্রাণ-অধিকারের চাবি। তাই প্রশ্ন আসে মনে- কবিতায় আমি কী বলতে চাই? উত্তর আসে- কিছুই বলতে চাই না, শুধু ইশারাটা ধরতে চাই, ইশারা দিতে চাই। রাতের সেই আধফোটা, আধজাগা গাছগুলির জুঁই অথবা টগর হয়ে ওঠার মতো যা। তাই সরে যাই এক পথ থেকে অনেক পথে, ধরাটা কখনো স্থির হয় না, চলে অবিরত। সে রকম, সেই যে লাল রঙের দাঁড়িয়ে থাকা স্টেশন, ট্রেন চলে যায় সামনে দিয়ে শুধু। হলুদ দাগের কিনারা হতে রেলস্লিপারের কয়েদি-চোখ একা জ্বলে ওঠে। সেইসূত্রে এই ধারণা জাগে মনে- কবিতার কোনো সত্য নেই, কোনো মিথ্যাও নেই। আছে একটি আকার গ্রহণের চেষ্টা, চোখ মুখ নাক কান গলা নিয়ে ক্রমশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। এই জ্বালা বা যন্ত্রণার কী রঙ, কী বিশেষণ, কী স্থিতি বা অস্থিতি? যদি কিছু একটা থেকে থাকে তাহলে কবিতার মিথ্যা কবিতার নির্মাণে, কিন্তু ভাবে ও বোধে লুকিয়ে থাকে কবিতার সত্য। এই সত্যের কোনো প্রমাণ নেই, কোনা নিশ্চয়তা নেই, আছে শুধু অনুভব-উপলব্ধি, অভিজ্ঞতার একটা লাইট-হাউজ- যার দূর থেকে আসলে কোনো আকার হয় না, সংজ্ঞা হয় না, শুধু থাকে নীরব বিচ্ছুরণের দান। যে এই অনুভব-উপলব্ধিকে তার চিন্তাবোধের সাথে মিশিয়ে দিতে পারে সে তো কিছু দেখে, আগের ও সামনের। সেই রকম দেখার সাথে বাস করা উপলব্ধির ঘুম ঘুম অবস্থান থেকে কবিতার উত্থান, নীরবে, লোকচক্ষুর আড়ালে। তাই প্রকাশে তার আলোও না, অন্ধকারও না। প্রকাশই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সেটি একটি চলন্ত মানসিক অভিজ্ঞতা যার চারিদিকে আছে কতগুলি প্রতিষ্ঠিত সামাজিকতা।

কিন্তু যে কবি, সে এইসব প্রতিষ্ঠিত সামাজিকতা, ইতিহাস, লোকসভ্যতার স্তরায়ণস্পর্শ উপস্থিতি বিনিয়োগযোগাযোগ ইত্যাদি থেকে উঠে গিয়ে সেই লাইট-হাউজের বিশেষ আলোয় তার রসায়নের ঘটনা ঘটায়। তখন কবিতার সৃষ্টি হয়। তার মানে লেখাটা আপাতত একটি যৌথ ক্রীড়া হলেও, কবির এই সামজিকতা একটি ভান মাত্র, একটি গোপন চাঁদমারি। । তার জন্যও তো একটি অপেক্ষা আছে, কখনো একদম প্যাসিভ মুড নিয়ে, চলন্ত কিন্তু স্থির, উড়ন্ত কিন্তু নিশ্চল।

যেহেতু সামাজিক তাই কবিতার হয়ে ওঠার এই অন্তহীন অদৃশ্য যোগাযোগ বিনিয়োগ কিন্তু ভাষার প্রজনন-প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ নয়। কারণ কবিতার আকার আকরণ ঘটে শেষ পর্যন্ত একটি মানবভাষাকে ধরেই। ভাষা যেহেতু একটি সামাজিক সাংঘঠনিক সিস্টেমেটিক মাধ্যম, তাই কবিতা লেখার জন্য কবিকে সেই স্বনির্মিত খোলস ভেঙ্গে আলো-অন্ধকার পেরিয়ে জনসম্মুখে বেরিয়ে আসতে হয় একদিন। আসতে হয় যোগদান করতে- একটি পূর্ব নির্ধারিত ভাষিক কার্যে। একটা অকেজো দায়বদ্ধতা দেখাতে হয় কখনো। এই সামাজিক ভাষাকে নিয়ে অক্ষম একটি কায়দা চালানো যায়। কিন্তু ভাষাই কবিতা নয়। ভাব, বোধ আর কল্পনার ঢেউটি যদি বড় না হয় তাহলে ভাষা শুধুই অথর্ব আর নপুসংক একটি আয়োজন। আমাদের সামনে একটি ব্রিজের বাস্তব উপস্থিতি থাকতে পারে। সাধারণ চোখ এটিকে শুধুই একটি কাঠের বা ইস্পাতের প্রয়োজনীয় বাহন হিসাবে দেখে। 'ব্রিজ' শব্দটাই তার সব ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে, গাড়ি ঘোড়া, পারাপারের ব্যস্ত অভিজ্ঞান নিয়ে আসে। কিন্তু একজন কবির চোখ ব্রিজটার একটা প্রাণ পাওয়া চরিত্র উপস্থিতি টের পায়। এর সংযোগ সীমানা চিন্তা করতে পারে প্রাচীন যুগের কোনো পাহাড় বা ডানাওলা পাখির সাথে। যার তলা দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সময় নামক আর এক বিবিধ রঙের ধারণা। বস্তু ছাড়িয়ে, এর গভীর গভীর আবহে আর মূল্য সংযোজনে একটি নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম হয়। কবিতায় যা একটা নতুন ভাষা দেয়। অন্যদিকে শুধু শব্দ কারসাজি একটি অকবিসুলভ মুদ্রাদোষ-কখনো তার যাদু কবিকে স্বীকৃত, নিরাপদ ও বহু ব্যবহৃত ভাষিক অলঙ্কারের ক্র্যাফ্‌টম্যানশিপ বিহ্‌বলতায় ফেলে দেয়। সে প্রাথমিক সংগমবোধকে উপলব্ধি না করেই ভাষার চর্চা করে শুধু যা মূলত যান্ত্রিক। ভাব ও কল্পনাবোধ বা এই বোধিভাবনা ছাড়া সামাজিক নিয়মকানুন বা কোনো একটা ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে ভাষার ঝিল্লি দিয়ে লিখিত করা যায় মাত্র, প্রাণদান করা যায় না, কবিতা করা যায় না। কারণ এই ভাব, গত ও আগতের চিন্তা, অনুভব-উপলব্ধির সাথে ভাষার আক্রমণে কবিতার জন্ম। নিশ্চিত, এরকম দৃশ্য অদৃশ্য যোগাযোগ ছাড়া কবিতার কোনো উৎপাদন নেই। কবিতার জন্ম বিবিধ চিন্তা, বহু বস্তু,

বস্তুবিচ্ছিন্ন স্মৃতি বা জ্ঞান-নির্জ্ঞান, ভাবি কালের অনুভবের সাথে জড়িত। কিন্তু লক্ষ্য করি যে প্রথমে ভাব ও চিন্তার নিমজ্জনে, আবার পরবর্তীতে এই বিশেষ ভাবের নাশকতায়, ভাবনার নিধনে কবিতার সৃষ্টি চলে। কারণ তাকে সামাজিক ভাষার বশবর্তী হতে হয়, শৃঙ্খলিত হতে হয় পদে পদে। কবিতার হয়ে ওঠার সাথে সংশ্লিষ্ট এই বাস্তব ঐতিহাসিক ভাষিক যোগাযোগের প্রলেপটুকু বাদ দিলে দেখা মেলে এক অহংপীড়িত মনোসত্তার, যার দখলে আসে এক স্বৈরাচারি বাসনা। কারণ মন যে কোনো আধারকে, যে কোনো সময়কে নিজের ভেতর গজিয়ে তুলতে পারে। তার ভাষার দরকার পড়ে না।

তাই কবিতার হয়ে ওঠা কবিতার মিথ্যা কিন্তু ভাব আর অনুভূতির সত্য। এই সত্য অভিজ্ঞতার মুক্তি- বিমূর্ত বিশৃঙ্খলে, কখনো আপাত অর্থহীন, নতুন অর্থের সাজসজ্জায়। যেমন আমাদের এই বাইরের পৃথিবী। শৃঙ্খলতা যতটুকু আছে তা তো আমাদের এই খালি চোখে দেখা। সেখানে একটি আড়াল, ছলনা, মিথ্যার উপস্থিতিছাপ অহরহ। যেমন যাকে দেখছি চোখের সামনে এখন সে তো আসলে এমন নয়, আসলে সে বিভিন্ন রূপ ও সত্তার, অন্য কিছু। তাই আপাত যুক্তিবিরোধী বলাটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পৃথিবীর চারিদিকের বস্তু সামগ্রীর-ছদ্মবেশী আক্রমণ হওয়ার ফল। কবিতার জন্মপরিচয় যেমন আছে নিজের কাছে নিজের মনোভূমিতে, তেমনি তার মুক্তি তার আহরিত পরাভাষায় যা আপাত সংখ্যাজ্ঞানহীন, ব্যাকরণের অ্যানাটমিতে যাকে কাটাছেঁড়া করেও তার স্বভাবটি চেনা যায় না, তাকে ঠিক পাওয়া যায় না। তার ক্রনোলজি ধরা যায় না। সেই জয়ী যে কি না তাকে ধ্যান করে তুলে আনতে পারে মনোভাষায় ধরা, না-লিখিত অবস্থা থেকে, ব্যক্তির গোষ্ঠীগত সামাজিক ভাষার ভেতরে গুম হয়ে যাওয়া আর একটি সুপ্ত ভাষায়।

ভাষার আবহমানতায় থাকে- মানুষের তৈরি কৃষ্টিকালচার, মানুষের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, বস্তু বা বস্তুরহিত রূপকাঠামোর যোগাযোগ। ব্যক্তির সাথে কাল কালহীনতার মিলন,তলে তলে বাহিত জ্ঞান বিজ্ঞানের চালচলন। সেই সূত্রে তার ভেতরে গড়ে ওঠে নীরব ভাব, বোধ, পর্যবেক্ষণ-পঠন, যা একটি প্ররোচনা তৈরি করে মনে, শেষ পর্যন্ত তার ভাষাবোধের সাথে মিলে যায় এটি। এরকম যোগাযোগে একটি মাটির দলা তৈরী হয় প্রথমে, তার থেকে ধীরে ধীরে এক একটি পদ, পদবিন্যাস, আকার। তার পথ ধরেই তৈরি হয় ঘাস মাঠ জলাশয়, তখন গাছ ওড়ে, পাখি ডাকে। তাই কবিতা সবসময় বিচ্ছিন্ন, একদম ছন্নছাড়া কোনো ঘটনা নয় হয়ত। একটা হয়ে থাকা, জুড়ে থাকা শিকড়ের সাথে, মায়ের

নাভিদড়ির সাথে সন্তানের যেমন। কিন্তু সেটি ধীরে ধীরে আলগা হয় কবিতার নুতন বোধ, নতুন পথঅভিজ্ঞতা আহরণের সাথে সাথে। তার সাথে ঘটে ভাব-কল্পনা, অনুভবের ক্রম বির্বতন। এইগুলি একটি ভাষাবোধের সাথে মিশে থাকে গোপনে, বা তৈরি হয় হাজার হাজার বছর ধরে। তাই কবিতা শূন্যের হতে পারে, হতে পারে আকারের। তার শিকড়সন্ধানী হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ভাব-কল্পনা সবকিছু থাকে পথে, সেই পথ অবলম্বন করে কবি। তাই কবিতার হয়ে ওঠা বা গড়ে ওঠা কোনো রকম জন্ম-মৃত্যু ছাড়াই। পথ-ভ্রমণ থেকে তার উত্থান, পথ থেকেই সে সংকেত ধরে আনে, আনে সম্ভাবনা। পথেই সে নাঙ্গা হয়, পথে গড়ে ওঠা শত সহস্র পাঠশালার জাতক হয়। এই পথে পলায়নের নাম করে যে নামে, সে সৃষ্টি করে এক পরা-ভাষা–আক্রান্ত বিবিধটানেল। সেই টানেলের আলো অন্ধকার ধরে তখন উপচানো পানির মতো কবিতা আসে। শব্দ শোনা যায়।

২৯/১০/২০১২

কবিতার শত্রু

কবিতার শত্রু কারা? মাঝে মাঝে ভাবি। দুই রকমের শত্রুর কথা ভাবা যায়। ১) সলিড টাচেবল বা বস্তু-শত্রু ২) ফর্মলেস আইডিয়াজ বা চিন্তা-শত্রু। অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, প্রকৌশলী, ভাষা-পণ্ডিত, কোর্পরেট ব্যবসায়ী, প্রশাসক, রাজনীতিবিদ, ছাত্রনেতা, জমির দালাল, পুলিশ, জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক, ছন্দ যাদুকর, ছড়াকার, আবৃত্তিকার, পত্রিকার সম্পাদক, লাক্স সাবানের প্রযোজক (সুন্দরীরা নন অবশ্যই!), ইত্যাদি ছাড়াও আরো ভীষণ লোকজন যারা ছায়ার মতো ঘোরে, যারা রঙ বদল করে সকাল বিকাল বিভিন্ন সমাজ সংগঠনে ঢুকে পড়ে, এমন কি যারা গান করে, গান দেখে, কালারফুল পাঞ্জাবি পায়জামা পরে, ঘন ঘন বিড়ি ফুঁকে, লম্বা চুল রাখে, কবি হওয়ার ভান করে--এরা হলো সলিড টাচেবল বা বস্তু-শত্রু ।

ফর্মলেস আইডিয়াজ বা চিন্তা-শত্রু আবার কারা? এই যে আমাদের চারদিকের সমাজ, সংসার তার ভেতরে বেড়ে ওঠা আমাদের চিন্তা ভাবনা, আমাদের ভাষা, আমাদের সংস্কার, বিশ্বাস এইসব হলো ফর্মলেস আইডিয়াজ বা চিন্তা-শত্রু । চিন্তা-শত্রু কেন? কারণ এগুলো শুধুমাত্র এমন একটি সামাজিক মূল্যবোধকে গড়ে তোলে যার প্রথম ও প্রধান কাজ হলো- যে কোনো কিছুর ব্যবহার-মূল্য আবিস্কার করা। বস্তু বা চিন্তার মূল্য তাদের সামাজিক চাওয়া পাওয়ার সাথে এক না হলে সেই বস্তু বা চিন্তাকে তারা গ্রহণ করে না।

সৃষ্টির প্রাথমিক পর্যায় থেকে আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার ইতিহাস হলো বস্তুবাদি আর ভোগবাদি মানুষের ইতিহাস। অধিকাংশ মানুষই ডিপ ইন্ট্যুইশন থেকে আগত ব্যবহারিক মূল্যহীন শুধুমাত্র 'সৌন্দর্যমূল্য' এর চেয়ে বস্তু বা চিন্তার শ্যালো ইন্টারপ্রিটেশনকে বেশি মূল্য দেয়। কবিতা কবির বোধ আর চিন্তাকে ভাষার মাধ্যমে এমন একটি শিল্পকাজে পরিণত করে যে এখানে মানুষের দৈন্দিন ব্যবহারিক মূল্য নির্ধারণতা- একটি অসাড় কাজ বলে পরিণত হয়। তাই তারা কবিতা নামক ভাব বা বাষ্পকে পারলে পুড়িয়ে মারে। এই যে দীর্ঘ দিন ধরে আমাদের কাছে থাকা চারদিকের প্রতিষ্ঠিত প্রায় স্বাভাবিক সামাজিক মূল্য 'বিচারক্ষেত্র' সেখানে কবিতার মতো একটি 'সৌন্দর্যমূল্য' জড়িত ভাষাকাজ, যা আবার সামাজিক ব্যবহারিকভাবে অকেজো-- তার কি যে অসহায় অবস্থা তা আন্দাজ করতে কারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

একজন বাস্তববুদ্ধির মানুষ কবিতার শত্রু হয় বা কবিতাকে সমাজের অন্যান্য মূল্যবান কাজ থেকে দূরে রাখে কারণ কবিতা দিয়ে তার কিছুই হয় না। মানে তার কাছে এটির কোনো অর্থনৈতিক মূল্য নাই। তাই কবিতার পাঠক সর্বকালেই বিরল। কারণ কবিতার কাজ এমন একটি ভাষাকে নিয়ে যেখানে বস্তু বা বস্তুরহিত এক অমোঘ রসচেতনা- সুন্দর বা অসুন্দর যাই হোক- তা প্রকাশ পায়। সেখানে অর্থনীতির প্রবেশ নিষিদ্ধ। কবিতা ভাব আর ভাষার কাজ। অনেক সাবজেক্টই তো ভাষার কাজ। কিন্তু সেগুলো সমাজ সংসারকে, রাষ্ট্রকে একটি মূল্য দেয় ও মূল্য নেয়। কবিতার ভাষা কাউকে মূল্য দেয় না, নিজেও মূল্য নেয় না। যা করে সেটি হলো একটি বিশেষ ভাষার হাত ধরে সে আপনা আপনি কোথাও জেগে ওঠে। এই যে কোথাও জাগে তার ধ্বনি একজনই শুধু শুনতে পায়- সে হলো কবি।

আমার বিবেচনা:

১) কবিতার পাঠক কোনোদিইন বেশি ছিল না। টুথপেস্টের অ্যাড বা ফাংকি গাড়ির ওপরে বসে থাকা নগ্ন নারীর ছবি/ওয়েব-পাতা নিয়ে আম-পাঠকদের মনে যেরকম হালকা আনন্দ-প্রতিক্রিয়া হয় তার সাথে কবিতার আয়োজন/ওয়েব পাতার পাঠকের বিশুদ্ধ আনন্দ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে এক করে দেখার উপায় নাই।

২) কবিতা লেখা যেমন আপনা-আপনি ব্যাপার তেমনি কবিতা পাঠ করাও আপনা আপনি। এখানে জোরাজুরির কোনো অবকাশ নাই। কবির আচ্ছন্নতা তার নির্ভেজাল সমর্পণ-শক্তির উপর ভর করে কবিতার জন্ম। কবি-ব্যক্তি বিশেষে তার তারতম্য ঘটে। তাই কারো কবিতা লেখা না লেখার ওপর বিবেচনা করে বলা যায় না কবিতার কোনো ভবিষ্যৎ নাই।

৩) ধনী/গরীব, নজরুল/রবীন্দ্র, হিন্দু/মুসলমান, আমেরিকা/রাশিয়া, দেশি/বিদেশি ইত্যাদি বাইনারি চিন্তাধারাকে ঠাঁই দিয়ে বা বাদ দিয়ে কবিতার সৃষ্টি ঘটে না। কবিতা কোনো ধরণের শর্তের অধীন না, কবিতা স্বয়ংপ্রকাশ। তাই ভালো কবিতার দেখা না পাওয়া মানে ভাবতে হবে- ভালো কবিতা হয়ত কোথাও লুকিয়ে আছে।

৪) কবিতা দিয়ে মানুষের শুভবোধ সৃষ্টি করা যায় না, যুদ্ধও হয় না। শুভবোধ, ভালোমন্দ বিচারবোধ মানুষ পায় পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র থেকে। কবিতা শুধুমাত্র পাঠকের বিস্ময়বোধকে আবারো বিস্ময়ে ভরে দিতে পারে। তাকে দিতে পারে নতুন একটি জন্মলাভের অভিজ্ঞতা।

৫) খুন, রাহাজানি, ছিনতাই বদ- রাজনীতি ইত্যাদি সময় আর সমাজের গহ্বর থেকে আসে। অপরদিকে কবিতা সরাসরি সমাজের বাই-প্রডাক্ট না, এটি একটি প্রতিভা আর ভাষার উত্তরাধিকারের যৌথ কারবার।

৬) ভালো কবিতা আর মন্দ কবিতার মধ্যে ফারাক করার যে স্বাভাবিক জ্ঞান বোধ- অনেক কবি- বোদ্ধা ও সমালোচকের মধ্যে নাই। থাকলেও তারা কূটচাল আর সুবিধাবাদিতার কাছে নিজেদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে। সম্প্রতি বাংলা একাডেমী কর্তৃক বাছ বিচারহীন কবিতা সংকলন প্রকাশ করার কাজটি এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সাথে আরো পত্র পত্রিকা(অনলাইন সহ) আছে। মাঝে মাঝে এমন সব কবিতা সম্পাদকেরা ছাপায় তা পড়ে নিজের কাছেই লজ্জা লাগে। তাই ভালো কবিতার পাঠক সৃষ্টি হবে কিভাবে? নতুন কবিরাও নতুন পথটিকে চিনবে কিভাবে?

৮) মানুষের চিন্তাবোধ, জ্ঞান কাঠামোতে অনেক পরিবর্তন আসছে। কিন্তু বাংলাদেশের কবিতা, কিছু হাতে গোনা ব্যতিক্রম বাদে, এখনো প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আবহ, আর রবীন্দ্র, জীবনানন্দীয় লিরিক্যাল, মধুর ভাষায় সয়লাব। দরকার নতুন চিন্তা আর নতুন ভাষা।

৯) যে কবিতা লিখবে সে যে কোনো মূল্যেই লিখবে। তার কাছে কবিতা লেখা প্রায় একটি রেলিজিয়াস কাজ। লেখাটি তার কাজ নয় তার আনন্দ। এটি না করলে সে বাঁচবে না। তেমনিভাবে যে কবিতা পড়বে সে যে কোনো মূল্যেই তা পড়বে।

১০) গ্রুপ করে বা আয়োজন করে কবিতার উপর আলাপ আলোচনা রেখে কবিতা সৃষ্টি হয় না। কবিতার প্রথম ও প্রধান শর্ত একা হয়ে যাওয়া, আপনাতে বিলীন হয়ে যাওয়া। বোধ আর ভাষার উত্তরাধিকারের হাত ধরে আর একটি নতুন উপলব্ধির দিকে যাওয়া।
১৫/০২/২০১২

হাইডেগারের চিন্তাজগৎ : কবিতা কিভাবে সৃষ্টির দরোজা উন্মোচন করে?

মার্টিন হাইডেগারের সারা জীবনের দর্শন- প্লেটোর সেই যুক্তি নির্ভর ও নিশ্চয়তা-সন্ধানী জ্ঞানের জালে আটকা পড়া পশ্চিমা দর্শনের ভ্রান্ত পদ্ধতির বাইরে, বিয়িং(Being) এর স্বরূপ আবিষ্কারের সাথে সাথে, নতুন ভাষার এক গোপন দরোজা উন্মোচনের(uncovering) দর্শন। তিনি প্লেটোর ধারার দার্শনিক যেমন দেকার্ত, কান্ট, ও নিৎসের পাগল করাসত্য-খোঁজার পরিবর্তে-সত্যর অর্থ আসলে যুক্তি তর্ক করে কোনোকিছু পাওয়া নয় বরং সত্য বলতে তিনি সত্তার(Being) এক রকম প্রকাশ- যার মাধ্যমে একটি গোপন 'উন্মোচনকে' আবিস্কার করা যায়- এ বিশ্বাসে চিন্তা করেছেন। তার সেই ম্যাগনাম ওপাস- 'বিয়িং অ্যাণ্ড টাইম'এ আসলে আমাদের সেই 'আমি' কে পৃথিবীর সব কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, যা মনে করি সেখানে এই বিচ্ছন্ন 'আমি' নয়, সমস্ত পৃথিবীর 'আমি' মানেসবার 'আমি'। কারণ তিনি বলেছেন Being with' মানে আমার পৃথিবী আমারই সত্তার(পরম!)অবিচেচ্ছদ্য অংশ। তাই সবারই সাথে আমার 'আমি'কে এলিনিয়েটেড, ব্যাধিগ্রস্ত একা হয়ে চলার কোনো কায়দা নাই। দর্শন আমার বিষয় না কিন্তু এই দার্শনিকের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে কারণ তিনিই প্রথম(কবি ও দার্শনিক কিয়ের্কেগার্দের পরে) কবিতার যাদুময় অপার সম্ভাবনার ভাষার প্রতি আস্থা রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দার্শনিকের ভাষা সীমাবদ্ধ,এই ভাষা দিয়ে 'Being' কে আর ব্যাখা করা সম্ভব নয়। কেননা কবিতার অবাধ, শক্তিশালি, সম্ভাবনাময় ভাষা দিয়ে 'সত্তা'কে যেভাবে উন্মোচন করা যায়, দর্শনের ভাষা দিয়ে তা করা যায় না।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দার্শনিক আলোচনাই প্লেটো'র সেই 'সত্য' খোঁজার জন্য অস্থির। এই পদ্ধতিতে আমরা সাধারণত একটি হাইপোথিসিস দিয়ে কাজ করা শুরু করি তারপর অনেকগুলো পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ, অ-প্রমাণ বাছ বিচারের মধ্য দিয়ে সত্য আবিষ্কারের দিকে যাই। হাইডেগারের মতে এই পচা সিস্টেমটাই দীর্ঘদিন ধরে জ্ঞান বিজ্ঞান তথা অভিজ্ঞতা আহরণের বিভিন্ন জায়গায় স্থান করে নিয়েছে। এর কোনো পরিবর্তন নাই। হাইডেগার এ বিষয়টি অস্বীকার করেন না বরং তিনি এই সিস্টেমটাকে সন্দেহ করেন। তিনি গুরুত্ব দেন হৃদয় দিয়ে বোঝার ব্যাপারটিকে, তিনি গুরুত্ব দেন বিয়িং এর মাঝে 'থাকা' প্রকৃত গুপ্তধন খোঁজার। তিনি মনে করেন যখন আমরা বস্তুর বস্তুত্বকে শুধু প্রমাণ করার

চেষ্টা করি, এর সত্য বলতে চাই, তখনই আমরা এর সাথে জড়িত অন্যসব সত্তার কথা ভুলে যাই।

তিনি এইসব কাজে বিরক্ত হয়ে কবিতার ভাষার দিকে চোখ রাখেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে কবির প্রথম কাজ হলো পৃথিবীর লুকানো সত্তার উন্মোচন, বস্তু আর বস্তুর সাথে জড়িত অন্যান্য সব বস্তুর সম্পর্ক আবিষ্কার। হাইডেগার মনে করেন আমরা যুক্তি তর্কের বেড়াজালে আটকে থেকে আমাদের সামনে থাকা রহস্য-দরোজাটিকে এড়িয়ে গিয়েই প্রথম ভুলটি করে বসি। এভাবে দর্শনের একটি সহজ তৈরি-পদ্ধতি গড়ে উঠেছে যেখানে মনে করা হয় সবকিছুর সহজ উত্তর দেয়া আছে। মানুষের কাজ হলো শুধু ক্রস আর টিক চিহ্ন দিয়ে পাতা ভরে রাখা। তারপর বইটাকে বন্ধ করে ফেলা। কিন্তু কবিরা কোনো বই বন্ধ করে না। আমাদের বুঝতে হবে- এই কোটি কোটি মানুষের পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তি ভিন্নভাবে অস্তিত্ব সর্ম্পকিত কাজে জড়িয়ে পড়ে। সেখানে শুধুমাত্র একটি পাওয়া সত্য-- বস্তু সম্পর্কে বা মানুষ সম্পর্কে সবকিছু বলা শেষ করে দিতে পারে না। আসলে হাইডেগেরিয় আনকভারিং' এর মাধ্যমে কবিরা আরো বেশি করে সৃষ্টিসত্তার কাছে আসতে পারে। প্লেটো শেখানো যান্ত্রিক সত্য খোঁজার মাধ্যমে নয়।

কবিতা যেভাবে সৃষ্টির দরোজা উন্মোচন করেঃ

তার 'চিন্তা' সম্পকির্ত আলোচনায় হাইডেগার আসবাবপত্রের একজন শিক্ষানবিশ কাঠ মিস্ত্রির উদাহরণ আনেন। শুধুমাত্র চর্চার কারণে এই শিক্ষানবিশ কাঠ মিস্ত্রি আসবাবপত্র তৈরি করে না অথবা কাজটি জানার জন্য সে মিস্ত্রি হয় না। একজন সত্যিকারের মিস্ত্রি বনে গিয়ে প্রথমে কাঠের মর্ম উপলদ্ধি করে, এর সত্তাকে বোঝার চেষ্টা করে। কবিতার জগতটাও ঠিক তাই। পৃথিবী আর সত্তা- সেই বনে থাকা কাঠের মতো যাকে পেড়ে আনা হয় --একেবারে তাজা নতুন গাছ থেকে। তার প্রতিটি অংশ ভিন্ন ভিন্ন মনোযোগ দাবী করে। যদি মিস্ত্রি প্রতিটি অংশকে এক মনে করে তাহলে সে হয়ত একটি কাজ চালানোর মতো টেবিল চেয়ার তৈরি করে। কিন্ত তাকে কাঠে থাকা বনের সেই 'রহস্য বা সৌন্দর্যকে' বাদ দিতে হয়। যে রূপ বনে ঘুমিয়ে থাকে তার সাথে বোঝা পড়ার জন্য সত্তাকে নিবিড়ভাবে জানার দরকার পড়ে, খালি কাজের ধান্দা করলে চলবে না। উন্মোচন চায় মিস্ত্রি বনে যাক, বনে গিয়ে এর রূপ রস গন্ধ বুঝুক । শুধু কাটাকাটি হলে বিষয়টি একটি মেকানিক্যাল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এটি একটি সম্পর্ক, প্রাণের সাথে

বনের কাঠের। যদি না হয় তাহলে এই ক্রাফ্‌ট(শিল্প) হয়ে পড়বে একটি যান্ত্রিক কাজ মাত্র। একটি কাঠের টুকরোকে বুঝতে হলে মিস্ত্রিকে স্পর্শকাতর হতে হয়, তখনই তার গোপন দরোজা খোলার অভিজ্ঞতাটি ঘটে। একইভাবে পৃথিবীর সকল অস্তিত্বকে কবিতা সাড়া দেয় তার স্পর্শকাতর, নমনীয় ভাষা দিয়ে। কবি যুক্তি নির্ভর, প্রমাণ নির্ভর 'সত্য' খোঁজার পরিবর্তে বস্তুকে তথা তার চারপাশকে প্রাণ দিয়ে উপলব্ধ করার চেষ্টা করে। পৃথিবীর প্রতিভাবান কবিরা তাই করেন।

হাইডেগারের চিন্তায় ভাষার কাজ হলো যা কিছু অব্যক্ত, গুপ্ত ও সম্ভাবনাময়- তাকে ভাষা দেয়া। তিনি মনে করেন এক্ষেত্রে আবার ভাষার একটি সমস্যাও আছে। প্রথমত ভাষা প্রতিদিনের কাজ করতে সহায়তা করে। আবার সে সত্তার গভীর, স্বাভাবিক সত্যকেও প্রকাশ করে। আমরা আমাদের অস্তিত্বকে বোঝার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করি ঠিক সেই ভাষাতেই আবার একজন নরসুন্দরের সাথে কথাও বলি। সুবিধা হলো যারা শুধু কথা বলতে শিখেছে তারাও কখনো কখনো পৃথিবীর অনেক কিছুর ওপর আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো এই সাধারণ ভাষা সহজভাবে ব্যবহার করে বক্তা আর শ্রোতার সিদ্ধান্তকে হালকা করে ফেলা হয়। তখন কবিতা এই সমস্যা দূর করতে পারে। এটি সাধারণ বোঝার ভাষা আর দূরের রহস্যময় ভাষা বোঝার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আমাদেরকে বুঝতে হবে কবিতার ভাষা গড়ে ওঠে অসাধারণ কথা দিয়ে। ভাষার রহস্য ঘুমিয়ে থাকে এই অসাধারণ কথাতেই। এই সূত্রে হাইডেগারের পছন্দের কবি হল হোল্ডারলিন। কারণ এই কবি তার কবিতায় ' অসাধারণ কথা' ব্যবহার করেছেন যা প্রকৃতির নিজস্ব ভাষা।

হাইডেগার আমাদেরকে নিয়ে যান সেখানে যেখানে আমরা তদন্ত আর কবিতার ভাষার মধ্যে পার্থক্য রচনা করতে পারি। তিনি মনে করেন দর্শন কোনো অসাড় ক্ষেত্র নয়। হাইডেগার অনুসন্ধানের ভাষাও ত্যাগ করেন না। তিনি শুধু সত্তার গোপন দরোজাটি খোলার জন্য একটি নতুন ভাষা-পদ্ধতি আবিষ্কারের ওপর গুরুত্ব দেন। তার মতে আমরা সব জায়গাতেই দার্শনিক প্লেটোর এই সত্য-মিথ্যা জাহিরের সীমাবদ্ধ কেজো ভাষা ব্যবহার করি। প্লেটোর পদ্ধতি আমাদেরকে সীমাবদ্ধ করে ফেলে একটি যান্ত্রিক চক্রে বেঁধে ফেলে। কিন্ত অন্য দিকে কবিতার ভাষা যেহেতু আনকমন কথাকে ধরে রাখে সেখানে ভাষা এই যুক্তি তর্কের কাঠামো ত্যাগ করে সত্তার আরো গভীরে যায়। তাই ভাষা হয় আরো গভীর। ভাষা উন্মোচন করে আমাদের সত্তার গেপান স্তর।
ছায়া: পোয়েটিক আনকাভারিং ইন হাইডেগার। বেন রজার্স।

১০/০৬/২০১৩

আহা বিদেশি বাতাস!

এই যে একটি বিদেশ, আমি চাই বা না চাই, আমাকে সে তার হাওয়া বাতাসের সাথে প্রতিদিন জোড় করে জড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু আমি যে স্বেচ্ছায় দ্বীপান্তরিত, পালিয়ে পালিয়ে তার প্রাণটাকে কতটুকুই বা ধরতে পারলাম। আজ কতদিন হয়ে গেল বিদেশে থাকছি! থাকা বলতে যদি ফিজিক্যাল শর্তটাকে একমাত্র সত্য মানি, তখন এই থাকাটাকে একটু সহ্যনীয় একটু মায়াবী করা যায় হয়ত!আর মানসিকভাবে থাকা- সে যেন পুরানের সিসিফাসের পাথর কুড়িয়ে আনার মতো একটা অনন্ত মধুর শাস্তি! আমি এই বোধ নিয়ে একটি ট্রাজেডির মধ্যে খেলা করেছি অনেকদিন। নিয়তির বিশ্বাসঘাতকতা হোক বা না হোক, যেকোনো ভাবেই আজ এই ভীষণ বাস্তবতার কাছে দাঁড়িয়ে পড়েছি। ইচ্ছে করলে তো আকাশটাকে অতিক্রম করতে পারি, কিন্তু না পারাটাও আরো একটি ভয়াবহ অদৃশ্য শক্তি, শুধু পেছন থেকে টান দিয়ে ধরে। যেন টু বি অর নট টু বি। দেয়ালের পাশেই ঘাতক কিন্তু তাকে বধ করবো কি করবো না সেটি ভাবতে ভাবতে নিজেই রক্তাক্ত, ছিন্ন ভিন্ন(বাঙালি হ্যামলেট!)

মাঝে মাঝে আমার কাছে মনে হয়েছে কবি হিসাবে বিদেশ থাকা একটি মহা আজগুবি ব্যাপার, একটি ধাঁধা, ঘূর্ণ্যমান প্রহেলিকা। কারণ এমন এক জায়গায় থাকা যেখানে শুধু ভূ-প্রাকৃতিক জগৎ, বাসাবাড়ি অপর নয়, ভাষাও অপর। ভিন্ন আকারের, ভিন্ন রঙের মানুষজনের কথা নাইবা বললাম। তাই প্রশ্ন জাগে- বিদেশে কি বাংলা কবিতা লেখা যায়? হয়ত লেখা যায়, ছদ্মবিদেশি হাফ-ভিনদেশি হয়ে লেখা যায়! যেমন সবাই তো লিখছি আমরা। কিভাবে লিখছি? এই জায়গায় একমাত্র সহায় আমাদের অনন্ত স্মৃতিবাক্স। হ্যারোল্ট প্রিন্টার যেমন বলেছিলেন কোথাও। স্মৃতি তখন এক জীবন্ত দেশের মত চোখের সামনে খেলা করে, স্মৃতি তখন একটি অবিনশ্বর স্বদেশ-চৈতন্য, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কারেক্টার যেন। তার কাছে ফিরে যাওয়া আর ফিরে তাকানো ছাড়া গতি নাই। তার হাত ধরেই গড়ে ওঠে প্রতিদিনের স্বপ্নচূর্ণ,জীবনবাস্তব বা পরাবাস্তবতা। তার থেকেই যেন কবিতার ভাষা আর একটি নতুন প্রেক্ষাপটে নিজেকে পুন:নিমার্ণের প্রাণ পায়। আর এক দেশের মাটি, জলবায়ু, গাছপালা মানুষজনের সাথে কবির নিজস্ব যাপিত সময়ের ক্ষণিক মিথস্ক্রিয়া ঘটে। তখন স্মৃতির বিভিন্ন কানাগলি খুলে যায়, কবিতার সাইকেল চলে, ঘুড়ি ওড়ে। একটি কবিতা যেভাবে মনের মধ্যে বাসা বাঁধে তার ভেতরে তো আগের দেশের ভাষার মর্মমূল, সে দেশের মা, মাটি,

মানুষ নীরবে একটি যোগাযোগ পত্তন গড়ে তোলে। বিদেশে তো দেশের তেমন কোনো ঐতিহ্য নাই, কৃষ্টিকালচারও নাই। তাই কিভাবে আমরা সেই পরিচিত দৃশ্য অদৃশ্য বস্তু অবস্তু, ঐতিহ্য ঘেঁষা জ্ঞান সংস্কারের কাছে যাই, তার স্পর্শ পাই? তার একটি উপায় হলো স্মৃতির দিকে মনের দরোজাটি খুলে রাখা। কিন্তু বিষয়টি এতো সহজ নয়। এমতাবস্থায় কিছু ভাবনা মাথায় এল। সেগুলো নিচে সাজিয়ে ধরলাম।

একটি নুতন ভূভাগের ফিজিক্যালিটি আপন করে নিতে যেহেতু অনেক সময় লাগে সেহেতু বিদেশ আরো বিদেশ হয় ক্রমশ। বিদেশ থাকা কবিদের সামনে কতগুলি মানসিক দুযোর্গ আসে তখন। যেমন তার দেশ নাই, তার সেই মানুষজন, ল্যান্ডস্কেপও নাই। তো এখন সে কী করবে, কিভাবে তার ভাষাভাবনা, চিন্তা চেতনাকে জাগাবে? নিজ ভাষার আদর যত্ন নিয়ে আয়েশ করে কবিতা লিখবে? আর বিদেশ থাকলেই তো বিদেশ নিয়ে কবিতা কেউ রচনা করেনা। বা রচনা করলেও সেটি শুধু পর্যটকের চোখে দৃশ্য দেখার মতো, গভীর গভীর ভাবে এটিকে উপলব্ধ করে লেখা হয়ত যায় না, যতক্ষণ না পর্যন্ত বিদেশ একদিন স্বদেশ হয়। অনেক সময় লাগে তাতে। কারণ প্রতিদিনই বিদেশের নতুন ফিজিক্যাল উপস্থিতির সাথে কবির মনে বসে থাকা তার নিজ দেশের মানসিক উপস্থিতির সাথে এক রকমের কনফ্লিক্ট হয়, দেন দরবার হয়, মুড ভালো থাকলে কখনো হয় বোঝাপড়া। তখনকার লেখা কবিতার মধ্যে নিজদেশ তার আশা আকাঙ্খা, তার জনমানুষ তার ইতিহাস, চারিদিকের বস্তুজগৎ, ঘরে উড়ানো পর্দার মতো দোল খায় বার বার। তার সাথে সাথে তখন এই বিদেশ আর একটি অচেনা কিন্তু প্রতিদিনের বাস্তবভূমি হয়ে অনাবিষ্কৃত জলখন্ডের মতো বড় হতে থাকে। সে তখন কবিতার মধ্যে একটি অপর ভূমির জোর উপস্থিতি নিয়ে, নিজের হাড়পোড়ানো স্মৃতির সাথে একটি টানটান টেনশন তৈরি করে।

একটি দেশকে তখনই বিদেশ মনে লাগে যখন এর লোকজনের মুখের ভাষা, বই পুস্তকের ভাষা ভিন্ন হয়। লোকজন এক সাথে থেকেও ভিন্ন কালচার বা ধর্মের হতে পারে কিন্তু এর ভাষা যদি এক হয় তাহলে চালচলনে, জীবন যাপনে, কবিতার ভাব ভাবনায় খুব একটা অসুবিধা হয় না। এটি ঠিক যে বিদেশের আলো বাতাস, নদ নদী, ফুল মূল, পশু পাখি দেশের মতো প্রায় একই। এমন কি এর ল্যান্ডস্কেপও। কিন্তু যেহেতু এদের সাথে দীর্ঘ দিনের ওঠা বসা নাই, জড়িয়ে পড়া নাই, তাই এগুলো তেমন করে আপন লাগে না। দেশের একটি পাহাড় বিদেশের একটি পাহাড়ের মতো দেখতে হলেও শুধু দূর দেশ হওয়ার কারণে, বোঝাপড়া

অভাবের কারণে অপরিচিত লাগে। তাই বিদেশ একটি ধারণা নয় অবশ্য। কারণ বিদেশ অধিকাংশ সময়ই ফিজিক্যাল, খুব অ্যাগ্রেসিভ। যে থাকে এর মধ্যে, সে তখন এর আক্রমণমুখর ভূ-বাস্তবতার মধ্যে নিজের শ্বাস প্রশ্বাস নেয়, এর ডাইনামিজম তখন ঘা দেয় আরো বেশি। বিদেশ তখন সুযোগ নিয়ে খুব লম্বা করে পা ছড়িয়ে আয়েশ করে চোখের সামনে থাকে। পালানোর কোনো জো নাই সেখান থেকে।

বিদেশ স্বদেশ হয় না কারণ আমি এখানে জন্ম গ্রহণ করিনি- এমন ভাবনার মধ্যে পুরোসত্য লুকানো থাকে না সব সময়। কারণ জন্ম নেয়ার মধ্যে নিজের রক্ত মাংস ছাড়াও আত্মার সাথে নিজ দেশের লম্বা শিকড় এসে জোড়া লাগে, গহীন বন্ধনে জড়িয়ে থাকে ওরা। হাজার হাজার বছরের সেটি। সেই কারণে শুধু মাত্র হঠাৎ জন্ম নেয়ার সাথেও বিদেশকে দেশ বানানোর সুযোগ থাকে না। সেই মোতাবেক মা, বাবার জন্মদেশই শিশুর দেশ হয়। কিন্তু একটি শিশু যদি একটি বিদেশের জল আবহাওয়া বিশেষত এর ভাষা সংস্কৃতিতে বংশ পরম্পরায় বড় হতে থাকে তা হলে হয়ত বিদেশ দেশ হওয়ার সুযোগ থাকে। কারণ তখন নিজ দেশ বলতে তার মাথায় কোনো স্মৃতিগাছ থাকে না যেমন আমাদের আছে, ফলমূল ছায়াসমেত। তাই প্রবাসী হিসাবে প্রথমে যে কালচারাল শকিং হয়, তার মধ্যে নিজ ভাষার সাথে বিচ্ছেদটি বাঙালি কবিকে একটি চ্যালেঞ্জের সামনে ছুঁড়ে দেয়। আর একে অতিক্রম করা আর অতিক্রম করে বাংলায় কবিতা চর্চা করতে হলে তাকে নতুন করে আর একটি দূরহ পথের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হয়। তাকে তার স্মৃতি ঘটনা, ভাষা সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্য ইত্যাদিকে পুর্নবিন্যাস করতে হয়, একটি অদৃশ্য টানেল খুঁড়ে সেখানে যাতায়াত করতে হয়।

ভান বা কিছু কিছু কম্প্রোমাইজ!

আজ আমরা মুখেমুখে যতোই জিয়ো-পোয়েটিক্স এর কথা বলি না কেন, বাঙালি কবি মানসিকভাবে নিজ দেশের ভাষা, মানুষ, প্রকৃতি আর ঐতিহ্য নির্ভর। তার থটপ্যাটার্ন এখনো সম্পূর্ণভাবে স্বদেশবিচ্ছিন্ন হয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চকিত অভিজ্ঞতা, একান্ত বস্তুঘন সত্তার চূর্ণপ্রভা প্রকাশমাধ্যম হয়ে উঠতে পারেনি। তার চিন্তার সাথে তার দেশ সবসময়ই অবিচ্ছিন্নভাবে একটি অদৃশ্য রক্তবন্ধন গড়ে তুলেছে। সে সব সময়ই স্বদেশমুখি, তার সজ্ঞায় তার মাতৃমূর্তি তথা মাতৃভাষা কখনো দুগ্ধফোটা কখনো সমুদ্রের উত্তাল স্রোতের মতো হানা দেয়। মাইকেল, অমিয় চক্রবর্তী সহ হাল আমলের যারা বিদেশ থেকে কবিতার চর্চা করছেন

তাদের কবিতায় আমরা এ জিনিসটি লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তাপরপরও বিদেশ ছলনাময়ী প্রেমিকার মতো কখনো কখনো তার মায়াবী দেহ আর চোখের ইশারায় বাঙালি কবিকে যে আত্মহারা করে না সেটিই বা অস্বীকার করি কিভাবে। তার থেকে যে সব কবিতা হয় সেটিকে আমরা জিয়ো-পোয়েটিক্স বা বায়ো-পোয়েটিক্স যাই বলি না কেন তা যে একটা কিছু হয় তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

সামাজিকতার এত দূর আর দুবোর্ধ্য আচরণ, এত অপরিচিতির পাষাণময় বিচ্ছুরণ তার ভেতরেও কিছু নির্ভরতা কিছু চোরা জলাশয় হয়ত আছে কোথাও- যার মাধ্যমে কিছু উপশম, আরাম পাওয়া যায়। আমরা যে বয়সে এখানে এসেছি সেখানে আর হয়ত এই বিদেশ তার 'বিদেশিত্ব' নিয়ে চরম হামলাটি করবে না। আমাদের গলে পড়া, ঘুমিয়ে থাকা মগজে আমাদের দেশকালচার, মা মাটি মানুষ সবই জলছাপের মতো ঘর করে আছে। প্রয়োজন শুধু একে নতুন জন্ম গ্রহণের স্বাদ গন্ধ দিয়ে জাগিয়ে তোলা, ভাসিয়ে তোলা। আর এই বয়সে এই পরদেশ তো কিছু দিতে বা নিতে পারবে না। আবার বিদেশ থেকেও বিদেশ বিদেশ নালাগার কারণ পৃথিবীব্যাপি ই-কাগজ, ই-সংস্কৃতির ছড়াছড়ি। ফিজিক্যালি হয়ত এরকিছুই দেখতে পারছি না কিন্ত অনুভব আর চিন্তাচেতনায় দেশ তার আলোআঁধার মাঠঘাঠ,দোকানপাট মাঝিমাল্লা, গরু, মহিষ, সাইকেল, রিক্সা, ভিড়বাট্টাসহ আরো জ্যান্ত একটি ফিগার হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই যে আন্তর্জালিক, ভার্চুয়্যাল ওয়ার্ল্ড এই যে দেশ, দেশের মানুষের ছবি, কথা লেখালেখি তাও কিন্তু গোপনে গোপনে একটি ছোট 'ভাষাদেশ' করে যায় নিজের ভেতর। নিজ ভাষার একটি নীরব ঘর হয়ে উঠছে এই জগৎ। তা দিয়ে ভাষাগত দূরত্বের বিষয়টি আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসছে, আস্তে আস্তে নতুনকবিতার জন্ম হচ্ছে। তাই বলি হতাশ হয়ে নয়, নিজেকে আবার নতুনে ফিরে পাবার আকাঙ্খায় বলি- ওপরে খোলা আকাশ, নিচে কোটি পাথরবেড়া আর সেই কারণে দূরের দেশ আজ আমার সামনে আরো জ্যান্ত আরো স্বয়ংপ্রকাশ। যদিও আমি কোনোদিন করতে পারবো না 'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব', তবুও আমার রক্তের মধ্যে নিহিত, আমার জিনকোডে লিখিত নিজ দেশের হাজার হাজার বছরের ঘুমিয়ে থাকা লক্ষ কোটি যাপিত জীবন যাপনের সুরগুলি দৃশ্যগুলি- এই বিদেশে নতুন করে পাওয়া ভাব ভাবনার সাথে মিলেমিশে আরো একটি নতুন ভাষাভাবনার কবিতার টানেল তৈরি করছে দিনরাত। সেই লোভ, সেই শান্তি!!

২২/০৮/২০১২

প্লেটো- কবিতার ভিলেন!

এটি একটি আজব প্যারাডক্স যে প্লেটো নিজে একজন খাস কবি হয়েও তার আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিতাকে বিদায় করেছেন। তার 'ডায়ালগস' তো কাব্যিক মাল মসলায় ভরপুর! কিন্তু প্লেটোর সত্যের প্রতি প্রায় মৌলবাদি দৃষ্টি আর আদর্শ রাষ্ট্রের ওপর তার অন্ধ বিশ্বাসের কারণে কবিতা হয়ে গেছে একটি অকেজো শিল্প। তিনি মূলত বিশ্বাস করেন যে শিল্প সময় সময় অনুকরণের ওপর দাড়িঁয়ে থাকে। তাই এটি আসলে বাস্তবতা, বস্তুর ইস্যান্স থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়। তিনি মনে করতেন মানুষের চিন্তা হল চূড়ান্ত বাস্তবতা। আমরা বস্তু পাই চিন্তার মাধ্যেম। যেমন আমার এই লেখার টেবিলটা কারিগর আগে চিন্তা করেছে, পরে সে কাঠ দিয়ে তৈরি করেছে। এখানে আমরা চূড়ান্ত বাস্তবতা মানে চিন্তা থেকে দূরে সরে এসে অনুকরণে হাত রেখেছি। তেমনিভাবে কবিতা, পেইন্টিং, সংগীত এরকম শিল্প চূড়ান্ত বাস্তবতা(চিন্তা) থেকে অনেক দূরে। কারণ কবিতায় যা বলা হয় তা চিন্তা বা রিয়েলিটির তৃতীয় ধারা (প্রথমে চিন্তা, চিন্তা থেকে বস্তু, বস্তুর প্রতিরূপ কবিতা)। তাই কবিতা অসত্য, ইল্যুশন।

প্লেটো কেন কবিতাকে আর দশটা পাঁচটা অর্থময়, রাষ্ট্র সেবাকারী কাজের ভূমিকায় না পেয়ে দেখেছেন অপচয় হিসাবে? তার অনেকগুলি কথার মধ্যে একটি কথা ছিল কবিরা ইমোশনকে উগড়ে দেয় যা মানুষের যুক্তিকে অন্ধ করে দেয়। সে মোতাবেক কবিতা মিথ্যা, আজগুবি আচার আচরণের জন্ম দেয়। তাই আর্দশ সমাজে কবিতা থাকলে তা হবে একটি উপদ্রব। এই বিষয়ে তিনি বিশেষ করে বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরকে কবিতা থেকে দূরে রাখার জন্য অভিভাবকের আহ্বান জানান। প্লেটো অবশ্য ধর্মীয় কবিতার লেখার বিষয়ে কোনো আপত্তি করেন নাই। তার আপত্তি শুধু এমন বিষয় নিয়ে কবিতা লেখা যা পাঠকের মনকে বিচার বিশ্লেষণে বিভ্রান্ত করবে। প্লেটোর এটির করার কারণ তার দর্শনের ওপর অগাধ ভালোবাসা। আর তার দর্শন নিশ্চয়তামূলক, কঠিন যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। যেখানে সব কিছুই সত্য খোঁজে। সত্যটা কী বস্তু? যা প্রমাণযোগ্য তাই সত্য। কবিতার কথা প্রমাণ করা যায় না, তাই কাব্যকলা সত্য কথা বলে না। কবিতা যেহেতু আবেগেকে গুরত্ব দেয় তাই এখানে যুক্তিকে মূল্য দেওয়া হয় না। এখানে তিনি প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্য 'ওডিসি'র কবি হোমারকেও মিথ্যা বলা, বানিয়ে কথা বলার জন্য দায়ী করেছেন। তিনি হোমারারের বীরদেরকে দেখেছেন যুদ্ধবাজ, অসভ্য, ধূর্ত হিসাবে। তাই তিনি মনে করেন কবিতা সমাজে নিয়ে আসবে মিথ্যা আর পাপ। তিনি আরো বলেছেন কবিরা কামচোরা। উদাহরণ কবি হোমার

কোনো সমাজের কোনো বৃত্তিমূলক কাজে জড়িত ছিলেন না। যা হোক প্লেটোর পর তার ছাত্র এরিস্টটল কিন্তু তার বিপরীত পথ ধরেই হেঁটেছেন। তিনি অনুকরণের তথা সত্য বস্তুর ধারণাকে তৃতীয় বারের মতো প্রতিনিধিত্বকারি সাহিত্যকে আনন্দযোগ্য উপকারী শিল্প বলে মনে করেন। এরিস্টটলের মতে কবিতা আগত কালের ইশারা দিতে পারে, ইতিহাস পারে না। কারণ ইতিহাস যা ঘঠে গেছে শুধু তাই বলে। তাই কবিতা উচ্চ মার্গের দর্শন।

যা হোক প্লেটোর এ রকম আক্রমণাত্মক কথার পর হাজার হাজার বছর কেটে গেছে। কবিতা লেখা থেকে কবিদেরকে কেউ বিরত রাখতে পারেনি। বরং কবিরা পৃথিবীর বিভিন্ন কালে রাজ দরবার, পরিষদবর্গে স্থান করে নিয়েছে। এমন কি আজ এই পুরো কনজ্যুমার শাসিত দুটি দেশ- ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতে কবিরা পোয়েট লোরিয়েট হিসাবে স্বসম্মানে দিনানিপাত করেন। কবিতা আজ মানব সভ্যতার গৌরবান্বিত অবিচ্ছেদ্য অংশ। দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার দর্শনের ভাষার উপর বিরক্ত, তিনি মনে করেছেন কবিতার ভাষার উপর দর্শনের ভবিষ্যৎ।

তাহলে প্রশ্ন জাগে-কবিতার বিজয় কেন? পৃথিবীর এমন নাম না জানা অনেক শিল্পকলাই তো ধ্বংস হয়ে গেছে বা হারিয়ে গেছে। শুধু এই আবেগ ধন্য, পরম ধনটি কেন আজো পত পত করে বিজয় নিশান উড়াচ্ছে? আশ্চর্য লাগে। মানুষ কেন আজো কবিতা পড়ে? হোক না সে কবি বা কবি-প্রায় কবি বা কবিতা পাঠক। অনেক কারণের মধ্য একটি অন্যতম কারণ হয়ত আমাদের ভেতরে এমন একটি সত্তা হয়ত আছে যে কিনা এক অনির্বচনীয় অনুভব বোধে আক্রান্ত হয়, আলো আঁধারীতে যায় আর কি যেন 'কিছু একটা' তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারে!

এই যে পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলি, এগুলি অসম্ভব এক মায়াবী ভাষা দিয়ে লেখা। যা সুর আর বাক-বিভূতিতে ভরা। এটি প্রমাণ করে যিনি এইসব বাণীবদ্ধ পুস্তকের মালিক, তার হৃদয়টাই তো দেখি বড়ই কাব্যময়। দেখুন কোরান, বাইবেল বা উপনিষদের ভাষা! এখন কথা হলো তাহলে কিভাবে মানবের মাঝে এসে এই কাব্যজ্ঞান দানা বাঁধল। ধর্মীয় দিকটা আমলে না নিলেও (যেখানে বলা আছে যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার ইমেজেই সৃষ্ট, তাই সেও এক ধরণের সৃষ্টি করে!) তার এই হিউম্যান ব্রেইনেই হয়ত এক ধরণের সেল আছে যা এমন একটি ভাষা খুঁজে যা ভাবকে প্রতিদিনের ভাষায় ব্যক্ত না করে, করে বিশেষ ভাষায়। যে ভাষায়

পাঠকের মনে সৌন্দর্যধারণা উপস্থিত হয়, আনন্দের জন্ম লাভ করে। তার প্রতিদিনের সমাজ সংসার চালনায় ব্যবহৃত ভাষায় কবিতা নাই, আছে ঐ বিশেষভাবে বলা সাজানো ভাষায়। আদিম মানুষের গুহাতে চিত্র আঁকা হয়ত সেই কবিদের মনের কথাই ছিল। সেগুলি তো প্রাথমিক কবিতা লেখার কথাই বলে। সেই 'ডিপ ইমেজ' ধারণা হয়ত সেখানেই ছিল। একদম প্রকৃতির ভেতর থেকে রক্ত, মাংস, শরীরের গন্ধ নিয়ে যেন সেই আদিম চিত্রকথা। ভাষাশূন্য মনে এক আদি কবি কবিতা-চিত্র দিয়ে বাঁধলেন তার প্রথম বোধ আর ভাবের কথকতা।

১৪/০৪/২০১৩

মুক্তপাঠ : লালন ফকিরের 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি' আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে আছ'

লালন ফকির

১০টি শব্দশ্বাস : খাঁচা, অচিন পাখি, মন-বেড়ি, আট কুঠুরি, নয়দরজা, আয়না-মহল, মন, আশা, কাঁচা বাঁশ, পাখি পালায়।

এই লেখক লেখার শুরুতেই আমাদেরকে একটা টেনশনে ফেলে দেন। চিড়িয়াখানায় বন্দি বাঘের টেনশন নয় এটি। এটি একটি মুক্ত হরিণের টেনশন- যে কিনা তার অজান্তে শিকারির জালে আটকা পড়ে গেছে! এই দৃশ্যটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠার সাথে সাথে আমরা আর একটা দৃশ্য পাই--হরিণটা তার মুক্তির জন্য লড়াই করছে। মানে দৃশ্যের অনেকগুলি স্তরে আমাদের টেনশন লুকিয়ে থাকে। যখন বুঝতে পারি যে লেখকের টেনশন জন্ম হয় একটা ধারণা থেকে তখন দেখি তার এই টেনশন আসছে একটা জিজ্ঞাসা থেকে। কী প্রকার জিজ্ঞাসা? আবার এই জিজ্ঞাসার আগে আসে একটি চিন্তা। আসলে চিন্তাটা শুরু হয়- একটা নেগেশন থেকে। 'আছি' নয় একটি 'নাই' ধারণা থেকে। যা শেষ পর্যন্ত 'অচিন পাখিটা কেমনে পালায়' থেকে বড় হতে থাকে। এক সময় দেখি লেখকের একটা সন্দেহপ্রবণ মনের জন্ম হয়। সে ভাবে পাখি পালিয়ে গেলে খাঁচা ঠিকই থাকে, কিন্তু খাঁচা কাঁচা বাঁশের তৈরি হওয়ায় তারও স্থায়ীত্বের কোনো নিশ্চয়তা নাই। তাই লেখকের টেনশন আরো দৃঢ় হতে থাকে। কারণ কাঁচা যে কোনো জিনিসই ভঙ্গুর আর অস্থায়ী। সেটি বাঁশ হোক বা বয়স।

পাখির 'থাকার' ধারণাটি থাকলেও- প্রশ্ন আসে- পাখি কিভাবে আসে আর কিভাবে যায়? আমরা বুঝতে পারি মানুষ প্রথম যেভাবে আত্মজ্ঞানে নিজের আয়নায় নিজেকে দেখে ও বোঝে সেখান থেকে সমস্যাটার শুরু। মানে আমি থাকলেও আসলে 'আমি নাই' এমন একটি অবস্থা থেকে প্রথম চিন্তার শুরু। পৃথিবীতে আসার পর মানব-সৃষ্ট বিবর্তনবাদ বা প্রকৃতি বিদ্যায় লাগাম নেয়ার আগে মনুষের চিন্তাযাত্রা হয়ত এরকম একটা হৃদয়বিদারক প্রশ্ন নিয়ে শুরু হয়ে হয়েছিল। 'আমি কী এবং যাবো কোথায়?' সেই মোতাবেক 'পাখি আসে আর যায়। ' যদি পুরো টেক্সটাকে একটা মেটাফর হিসাবে দেখি তাহলে-সেভাবে খাঁচা মানে এই মানুষের ইহজীবনের বস্তুবাচকতা। তাই প্রশ্ন আসে- কে এটিকে- এই ধাঁধার খনি হিসাবে তৈরি করেছে? এই চিন্তা মানষকে শুধু পাগলই করে ফেলে। কারণ প্রাকৃতিকভাবেই মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই চিন্তাগত সীমাবদ্ধতার

কারণে সে এই 'খাঁচা' নামক মেটাফরের কাছে এক সময় সে একটা আকারের সন্ধান পায়- শরীর বা দেহ নামে যাকে সে কল্পনা করে। যার ভেতরে মানুষ তার অস্তি-নাস্তির বীজ, মরা-বাঁচার দরোজা জানালাগুলিকে দেখে। বিশ্বাসী মানুষ এটিকে একজন সৃষ্টিকর্তার অধীনে নিয়ন্ত্রিত কর্ম হিসাবে দেখে- যা শেষ পর্যন্ত তাকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখায় না। কিন্ত মানুষ যখনই এই কর্মটিকে তার এই সর্মপণের অন্ধ ধারণা থেকে মুক্তি দিয়ে, তার নিজস্ব ভাবধারণার বশবর্তী করে আগায়, তখন সে একটি দ্বিতীয় চিন্তা করার শক্তি অর্জন করে। আর সেই চিন্তাটা আসে তার নিজেকে দেখার বা আবিষ্কার করার একটি আত্মদর্শন লাভের সুযোগ থেকে। তার শুরুটা হয় এই বস্তুবাচকতা তথা এই দেহটাকে নিয়ে। তখন লেখক আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। সে ভাবে-তার এই দেহের ভেতর কে থাকে? অচিন পাখি>সৃষ্টি না স্রষ্টা>নাকি দুজনই? এই লেখকের দেখা তথাকথিত 'বিশেষ জ্ঞান' এর আওতায় দানা বাঁধেনি বলে তিনি দাবী করেন যে শরীর একটা খাঁচা বা পিঞ্জর। তার ভেতরে 'অচিন পাখি' আসা যাওয়া করে। সে ভাবে পাখি আসে কিন্তু থাকে না কেন? যায় কই। তাহলে তো একটি সমস্যাই। মানুষের চিন্তার সমস্যা। পাখির এই আসা যাওয়া একদিকে কিন্তু ধর্মীয় হায়াত-মওতের কথা মনে করিয়ে দেয়। একটা নিদির্ষ্ট নিয়মের কথা মনে করিয়ে দেয়। মানে বোঝা যায় যে লেখক এক সময় তার 'আত্মজ্ঞান' পেরিয়ে আল্লাহজ্ঞান দ্বারা তার জিজ্ঞাসাকে মজবুত করতে চাইছে। সে প্রথম মানবের মতোই বিস্ময়াভূত হোন - এই অচিন পাখি কোথা থেকে আসে? শুধু শূন্য থেকে আসলে তো শূন্যতেই মিলিয়ে যেত। কিন্তু তা নয়। তার একটি অচিন আধারবাটি আছে কোথাও-- যেখানে সে পালিয়ে যায়! তার মানে সে কোথাও সব সময় থাকে। কোথাও 'হয়ে' আছে' আর এক মহাজনের সৃষ্টিরূপে। কিন্ত তাকে তো আমি সৃষ্টি করতে পারি না। তাই তার ওপর আমাদের কোনো অধিকার নাই। পারি না বলেই একটা ক্ষোভ, জ্বালা তৈরি হয়। একটা টেনশন তৈরি হয়। তার থেকে থেকে একটা জিজ্ঞাসার সৃষ্টি হয়। কেমনে আসে যায়? এটি কি কোনো কেন্দ্রহীন স্বাধীন ভাবধারা? মানে এটি কি কোনো প্রতির্ষ্ঠিত স্বীকৃত আর পরিক্ষীত মহাজাগতিক চিন্তার বাইরে?মনে হয় বাইরেরই। মানে এটি কোনো তেমন সংস্কারস্নাত জ্ঞানধারা নয় মোটেই। সংস্কারস্নাত জ্ঞান হলে এই রকম একটা চিন্তাময় জিজ্ঞাসা একটি উত্তর পেয়ে শুরুতেই নষ্ট হয়ে যেত। কারণ এরকম জ্ঞান আস্তে আস্তে 'আছে ধর্ম' স্থায়ী হয়ে ব্যক্তির বিশেষ স্বাধীন অবস্থাকেই পরাধীনতায় পর্যবসিত করে। কিন্তু লেখক সেদিকে না গিয়ে ব্যক্তির বিশেষ চিন্তাধারার উপর ভরসা রাখে। আত্মচক্ষু দিয়ে বুঝতে চায় পাখি কেন আসে যায় আর কেমনে পালায়?। কিন্তু ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত উত্তর পায় না বা উত্তর নেয় না। শুধু অচিন পাখির আগমন

নিগর্মন দেখে। এই লীলাতেই সে আবদ্ধ থাকে, মজা পায়। যেমন একদিন ডেনমার্কের এক রাজপুত পেয়েছিল। বাবার হত্যাকারী আসে আর যায়! তার করার কিছু থাকে না। হ্যামলেট যেমন অসহায় তেমনি এই ফকির লালন। খালি প্রশ্ন করে আর নাটক করে বেড়ায়। টু বি অর নট টু বি?হবে কি হবে না? মানে-কেমেন আসে যায়? কোথায় থেকে সে আসে নয়, কোথায় যাবে সে নয়। কেমন আসে যায়? এই আসা যাওয়ার 'খেল' টাই আসল। লাভ লোকশান কোনো বিষয় নয়।

তাহলে প্রশ্ন- কী আসে যায়? পাখিটি কী? তাকে কে পাঠায়? প্রাণ বলে যেভাবে আমরা ভাবি- তা তো নিশ্চয় নয়। যা থাকে সেতো আত্মা। প্রাণ দেহ আর মনের সম্মিলনের কারণে ঘটে। যা কিনা রক্তজাত। কিন্তু এই পাখি তা তো নয়। সে আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরের একটি চিন্তাপাখি- আত্মা। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়। আত্মা কী? তাকে কে দিয়েছে? এই প্রশ্ন এখানে নাই। নাই মানে যিনি দেয় তার চেয়ে বরং তার সৃষ্টি বা কীভাবে দেয় সে কথা কানে আসে। হয়ত পাখি নিজেই অধীস্বর হয়ে আছে খাঁচাটির ভেতর। পাখি কী? সত্তা, সৃষ্টিকর্তা- এ যেন কপালের এক অদ্ভূত খেল। সহজে উত্তর পাওয়া যায় না। আমরা জিজ্ঞাসা আর উত্তর না পাওয়ার সমস্যায় আটকা পড়ে যাই। 'কপালের খেল' বলে লেখক কোন জিনিসের দিকে ইশারা দেন? এটি বলে তিনি কী আবার একটি প্রতিষ্ঠিতপ্যাকেজে পা রেখেছেন? মানে আসমানি কোনো ধর্মের দিকে? ধরে নেই যে তিনি তাই মনে করেন। কিন্তু এখানে আমরা একটা 'ফানা' কর্মেরই যেন ইশারা পাই। মানে সৃষ্টি আর সৃষ্টিকারীর কোনো আড়াল তিনি রাখতে চান না।

কবি জীবনানন্দর- আলো আঁধারিতে যাই, মাথার ভেতর কোনো বোধ কাজ করে- এই ভয়ংকর কাব্যভাবনা সর্ববিনাশি অসুস্থ সময়ের চিন্তাফসল হলেও তা শেষ পর্যন্ত লালন আইডিয়াজাতই। খাঁচা নামক এই পৃথিবীর ভালোবাসা, প্রেমে মগ্ন 'আমি। ' আমার খাঁচায় ধরা এই রসভাণ্ড একদিন থাকবে না। মানে আবারো 'নাই। ' তাই লালন কাঁদে। জীবনানন্দও কাঁদে। কেন? সে কী এই খাঁচার মায়ায় কাদে?নাকি পরম যে সত্তা যিনি এই অচিন পাখি সৃষ্টি করছেন তার সাথে মিলবে বলে তার সাময়িক আনন্দমাখা কান্না। কার জন্য সে অপেক্ষা করে? প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত প্রশ্নই থেকে যায়। লেখকের ব্যবহৃত ভাষা আমাদেরকে তার ব্যক্তিগত ভাষার চেইন থেকে তার জন্মঅধ্যুষিত জনমণ্ডলির মুখের ভাষার কথাই মনে করিয়ে দেয়। মানে মনের ভাষা। রাখডাক নাই। তাকে শেকল দিয়ে পেঁচিয়ে আর একটি বিশেষ ভাষা বানানোর কোনো ইচ্ছা নাই। কেমনে, দিতাম, খেল,

রইলি আশে ইত্যাদি শব্দচয়ন তার ও তার সমাজের প্রতিনিধিত্ব যেমন করে তেমনি এই ভাষা হয়ে ওঠে এই রচনার রচনারীতির শক্তি। প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রায় জনবিচ্ছিন্ন পুস্তকীয় ভাষার বিরুদ্ধে কি এটি প্রথম ভাষাবিদ্রোহ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০টি শব্দশ্বাস : হিয়া, লুকিয়ে, দেখতেপাইনি, বাহির-পানে, ভালোবাসায়, আঘাত, আশায়, আনন্দ, খেলায়, গোপন প্রাণে, সুর গান।

এই লেখকের এই লেখা কোনো টেনশন থেকে জেগে ওঠে না। বলার কায়দা দেখে মনে হয় তার দেখার চোখটা খুব ক্যাজুয়াল। মানে এর ভেতরে লুকিয়ে থাকা কোনো অপেক্ষার যন্ত্রণা দেখা যায় না। কে আসে আর যায় বা থাকল কি থাকল না এটি কোনো ভাববার বিষয় না। যে আছে এমনিতেই আছে, হয়ে আছে- এমন তার উপলব্ধিজাত জগৎ। তার কোনো খাঁচা নাই, অচিন পাখিও নাই। তাই পাখি 'কেমনে আসে যায়' এটি নিয়ে তার মাথা ব্যথা নাই। তার খাঁচা নাই কিন্তু তার 'হিয়া' তো আছে। তিনি এতে কোনো মেটাফর ব্যবহার করেন না। তাতে আমাদের একটু বাঁচা বাড়ল। আমাদরকে কষ্ট করে অচিন পাখির ফুড়ুত ফুড়ুত যাওয়া আসা দেখতে হয় না। যদিও হিয়ার মাঝে কেউ লুকিয়ে থাকে- কিন্তু কে লুকিয়ে থাকে তার জন্য কোনো প্রশ্ন নাই। এই হিয়া থেকে কোনো পাখিও পালিয়ে যায় না। তাই তার ভেতরে কোনো সমস্যা বা কোনো জিজ্ঞাসা নাই। বলা যায় এটি তার জ্ঞান থেকে দেখা বা অর্জন। লাভ করা বোধের উপরের বোধ। কারণ সে জানে ‘হিয়া’ একটি বস্তু শরীরের ভেতর- যেখানে কারো আসা যাওয়া নাই। পরমজ্ঞানে যাকে জানা যায় সে তো আছে, সে তো কেবলই থাকে, যায় না কোথাও। সে থাকে রক্তমাংস সহ থাকে। তাই তার গ্রহণটাই গোপনে ঘটে। এই যে কেউ লুকিয়ে আছে এবং সে যে এই ব্যাপারটি জানে না - এই নির্জ্জান অবস্থা থেকে সে কোনো মুক্তি চায় না। কারণ সে বুঝতে পারে যে কেউ গোপন থাকে আগে থেকেই। তার এখানে থাকারই কথা। যে একজন থাকে সেটি তার উপলব্ধি, পরীক্ষা পাঠজাত। তাই এই লেখক বলা যায় একটি নিরাপদ আইডিয়ার সাথেই সুর মেলান। জীবনকে দেখার যে চোখ সেখানে পরতে পরতে পেলবতা, প্রাপ্তির সৌন্দর্য। অপ্রাপ্তির জ্বালা যন্ত্রনা বা আশাহত হওয়ার মত কিছু নাই।

প্রশ্ন তাহলে কে লুকিয়ে থাকে? এমনভাবে লুকিয়ে থাকে যে- এটি আছে যে সেটি বোঝা যায় না। শরীর আছে তো শরীরের মতোই। তার কোনো প্রসার নাই, ভাগবয়বধান নাই। কুঠুরি, দরজা, জানালা আয়নামহল নাই। এখানে কোনো অচিন পাখিও আসে না। তাহলে কে গোপনে আসে? সে কি তার পরিচিত কেউ? বোঝা যাচ্ছে যে এই আগন্তুক ঠিক আগন্তুক নয়। সেখানে সে রীতিমত অধিকার নিয়েই আছে। সে কী পরমাত্মা সে কী সৃষ্টিকর্তা? আমার মধ্যে তুমি আমি হয়ে লুকিয়ে আছে আর এক 'আমি। 'এই জায়গায় এসে লালনের সাথে তার একটা মিল দেখা যায়। যদিও লেখক রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত কোনো মেটাফরের দিকে যান না কিন্তু আমরা ঠিকই বুঝতে পারি যে 'হিয়া' তো খাঁচাই। গভীর গভীর এক খাঁচা। কিন্তু তার হিয়ায় কোনো অচিন পাখি আসে আর যায় না। যে আসে সে আসে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে। ওরা থাকে এক সাথে কিন্তু ব্যক্তির এমন অজান্তে যেন জানাই আছে সব সময়- সে সব সময়ই থাকে। মানে কোনো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয় এটি। সে চলে গেলে লেখকের বাঁচা মরা কিছুই ঘটে না। এখানে লালনের ফানাকেন্দ্রিক আইডিয়ার সাথে মিল পাই। কিন্তু লালন যেখানে বেশিক্ষণ আরাম করে বসে থাকতে পারেন না সেখানে রবীন্দ্রনাথ কিছু স্বভাব কিছু শ্রেণীগত কারণেই কোনো টেনশন পান না। সে মনে করে যে থাকে সে তো থাকেই। তার থাকার প্রয়োজনেই থাকে। তার এমন লুকিয়ে থাকা আর আর পাওয়ার ভেতর একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দ থাকে। আনন্দ এখানে একটা চিরস্থায়ী অবস্থান নিয়েই থাকে। তাহলে তো অপরদিকে দুঃখও থাকে। কিন্তু দু;খ এখানে একটা ঈসথেটিক দুঃখ। মানে দুঃখটা কোনো কিছু নাই বা কোনো কিছুর অভাব আছেই বলে ঘটে না। ঘটে কারণ অপর দিকে সুখের একটি নিশ্চিত অবস্থান আছে। সেই দু:খ ঘটে, হয় না। তা শুধু ঘটবে ব্যক্তির মানসিক বা দৈহিক শক্তিটিকে বোঝার জন্য। যে দুঃখের আর এক নাম সুখ। তাই তার উত্তরণ উপলব্ধির আনন্দে। 'তোমার কাছে যাইনি' বলে একটি হাহাকার থাকে অবশ্য। কিন্তু সেটি শুধু একটি সাবলাইম হাহাকার। মানে আছো তো, হারিয়েছি ক্ষণিক, আবার পাব 'তাকে'। তার থেকে ব্যক্তির হেমলেটিয় দোদুল্যমানতা আসে না। তবে এই যে না দেখে না বুঝে একজনের জন্য আফসোস তার থেকে হয়ত গোপন একটা মায়া কাজ করে। প্রশ্ন আসে - কীসের মায়া? পরমের সাথে মিলনের মায়া? বা কোনো নারীর সাথে মিলন? মিলন যে কারোর ষাথেই হোক, যেখানেই হোক, তার যে একটা গোপন না পাওয়ার বেদনা আছে- তা বোঝা যায়। সকল শান্তির যে আধার সে কোন জায়গা থেকে আসে? এমন কোনো প্রশ্ন নাই। তাই শুধু ঘটে নীরব সমর্পণ। সমর্পণ একটি সামন্ত শ্রেণীজাত ধারণা। তার সাথে বিদ্রোহ করার জোস নাই। কিন্ত লালন শাহ নামের লেখকের আছে। তার জিজ্ঞাসা তাকে একটি গোপন

বিদ্রোহের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের চিন্তা, সমাজ, সংস্কার বা ধর্মনীতি যাই হোক। লালনের করা প্রশ্নের উত্তর হয়ত তার অজানা নয়। কিন্তু যে প্রশ্নটা আসে তার বিষয়টা যেন সবারই অস্তিত্বের অংশ হয়ে যায়।

আত্মাকে লেখক রবীন্দ্রনাথ টের পান না। তিনিপ্রাণের গোপানীয়তা টের পান শুধু। তার মানে সে বুঝতে পারে যে -কেউ তাকে ঘিরে রেখেছে, সরলভাবে স্নেহ করে ধরে রেখেছে। তার পালিয়ে যাবার কোনো ইচ্ছা বা অধিকার নাই। তাই লেখক এখানে শান্ত, নিশ্চিত ও তৃপ্ত। মানুষের চিন্তাশক্তি বিকাশের দ্বন্দ্বকে দূরে ঠেলে এখানে রাজত্ব দেয়া হয়েছে- এই যে আমি পেয়েছি এমন শান্তিপ্রদ অবস্থান। তার মানে তার চিন্তার চেয়ে তার সংস্কার বিশ্বাস কাজ করেছে বেশি। মানে একটি পরমকে খোঁজা যার পরমতা বিষয়ে ইনি একটি স্থির ধারণা রাখেন। তাকে চ্যালেঞ্জ করবেন এমন টেনশন কখনো হয় না। আর লালনে- যা আছে তার উপস্থিতির চেয়ে যা 'নাই' তাই নিয়ে যতসব দ্বন্দ্ব । মন সব সময় রক্তাক্ত।

১০/০৯/২০১২

হোর্হে লুইস বোর্হেসের একটি কবিতা পাঠ

কবিতা ব্যক্তি, স্থান, অঞ্চল, লোকবিশ্বাস এমনকি এই যে আমাদের প্রতিদিনের ভাব-ভাবনা চিন্তা-চেতনা দিয়ে গড়া একটা বিশেষ কবিতাভাষা- সেই অমোঘ ভাষা ছাড়াই গঠিত হতে পারে। নিরেপক্ষভাবে জেগে উঠতে পারে অন্ধকার থেকে, শূন্য থেকে। কবিতা এমনই স্বয়ম্ভূ! কিন্তু কবিতাপাঠ ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় মানে তার পাঠে একজন পাঠক লাগে। পাঠকের দৈহিক ও মানসিক আকার আচরণ, অর্জিত রুচি, সংস্কৃতি শিক্ষা বা তার জিন নামক সেই আশ্চর্য মলিকিউল- তার চরিত্রনির্ধারণবিন্দুর প্রভাব, ব্যবহার লাগে। যদিও বয়সের সাথে সাথে এর স্থিতিস্থাপকতা এর রঙ বদলায় কিন্তু এই জেনিটিক বৈশিষ্ট্য হয়ত কোনোদিন বদলায় না। আর কত ধরণের যে পাঠক আছে কত ভিন্ন ধরণের দেখা আর অনুভব আছে- তা বলা বাহুল্য। কবিতার কাছে এদের আশা কামনা ভিন্ন রকমের। কেউ চায় তার দৈহিক অবয়বের কাছে বসে থাকতে। কেউ চায় তার নিচে ধরে রাখা ভাব আর শব্দসঙ্গমের যৌথ কারবারে নির্মিত কোলাজগানটি ধরতে। কেউ চায় সমাজ বিবর্তনের বাণী শুনতে আবার কেউ চায় এর সৌন্দর্য ভোগ করতে- এর অধরাঅমূল্যে কিছুক্ষণ সেই অনিবচর্নীয় আনন্দটুকু পেতে।

জীবনে কতো কবিতাই তো পড়লাম। মনে রেখেছি কয়টা। তবে কিছু কিছু কবিতার কথা আজো ভুলতে পারি না। অবসরে, কাজকর্মে, জনসংঘ বা সংঘহীনতায়, ভ্রমণে মাথার ভেতরে ঘুরে ঘুরে আসে। যেমন জীবনানন্দের 'ঘোড়া' 'আকাশলীনা' জন কীটসের 'নাইটিংগেলের প্রতি' আল মাহমুদের 'কবিতা তো এমন' বিনয় মজুমদারের 'একটি উজ্জ্বল মাছ' সহ কতো কবিতা। এখন সবগুলোর নাম মনে পড়ছে না এক সাথে। কেন মনে থাকে হয়ত এর কিছু কারণ আছে। হয়তবা তার বিষয়, ভাষা তার উপস্থাপনা রচনাশৈলী অথবা কানো কারণ ছাড়াই ভালো লাগে। এমনিতেই, যেহেতু কবিতার কোনো ব্যাখ্যা হয় না আসলেই। এমনভাবে পনের বিশ বছর আগে একটি কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কবিতার যে মাদকতা যে ব্যাখ্যহীন আবেশআছর আছে, আছে পাঠককে অনির্বচনীয় আনন্দপ্রদানের ক্ষমতা সেটি বুঝেছিলাম কেমন করে জানি। আজো সেই আনন্দ পাই এই কবিতাটি পড়ে। সময়, বয়স, স্থান বা কাল তাকে ধ্বংস করতে পারেনি। একজন পাঠকের কাছে এই বুঝি কবিতার অমরতা! কবিতটির নাম 'এন্টিসিপেশন অব লাভ' আর কবির নাম হোর্হে লুইস বোর্হেস। আসুন কবিতাটি একটু পড়ি।

Anticipation of Love

Neither the intimacy of your look, your brow fair as a feast day
not the favour of your body, still mysterious, reserved, and childlike,
nor what comes to me of your life, settling in words or silence
will be so mysterious a gift
as the sight of your sleep enfolded
in the vigil of my arms.
Virgin again, miraculously, by the absolving power of sleep.
quiet and luminous like some happy thing recovered by memory,
you will give up that shore of your life that you yourself do not own.
Cast up into silence
I shall discern that ultimate beach of your being
and see you for the first time, perhaps,
as God must see you---
the fiction of Time destroyed,
free from love, from me.

Jorge Luis Borges

কবিতাটির মূল বিষয় বা আয়োজন এরকম যে একটি নারী একটি পুরুষের হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। পুরুষটি আশ্চর্য- নারী নয় প্রেম নয় নারীর সৌন্দর্যতাড়িত কোনো যৌনকাতরতা নয়- যে স্থিরতার নিঃসঙ্গ আনন্দভার- যার নাম ঘুম সেই ঘুমই তার লক্ষ্য। সে অনুভব করছে ঘুমের সেই যাদুময়, ট্রান্সডেন্টাল শক্তিকে- যার স্পর্শে নারীটি আবার কুমারী হয়ে উঠছে। তারপর সেই পুরুষ ঘুমের মধ্যে প্রাপ্ত এই আশ্চর্য সুখী মুহূর্তের মালিক হতে চাইছে। সে দাবি করছে সেই ঘুমের মাধ্যমে প্রাপ্ত চূড়ান্ত শান্তিবাস বা নিষ্পাপতার মালিকানা যার মাধ্যমে সে দেখবে নারীকে প্রথমবারের মতো!। ঘুম এখানে গল্পের সেই সর্বনিরাময়ের প্রতীক যা ফিরিয়ে দেবে তার নির্জ্ঞানকে ফলত তার নিষ্পাপত্ব তার অসীমতাকেও। আর তার সাথে সাথে মুক্ত হয়ে পড়বে সে- নিষ্ঠুর টাইম-স্পেসের বন্ধন থেকে যা তাকে নশ্বরতার দণ্ডে দণ্ডিত করেছে। একদিকে এই ঘুম না-

জন্মানোর আকুলতাকেই যেন নির্দেশ করছে- যেমন জন্ম না নিলে কোনো কিছুই স্পর্শ করেনা মানুষকে- দঃখ জ্বরা এসব এমন কি ভালোবাসাও- যা মূলত দেওয়া-নেওয়ার মৌল স্বার্থপরতা তথা মৃত্যুতে বিলীন। তাই এই ঘুমের মাধ্যমে প্রাপ্ত-সৃষ্টির আদি মূহর্তে ফিরে গিয়ে এই আর্থলি মায়া থেকে সে মুক্তি কামনা করছে। এ রকম অনুষঙ্গ কিন্তু আমাদের মনে করিয়ে দেয় জন কিটসের 'নাইটিংগেলের প্রতি' বা এলিয়টের 'লাভ সং অব আলফ্রেড প্রুফক' কে অথবা জীবনানেন্দর 'বনলতা সেন' কে। যেমন কবি কীটস পাখির মৃত্যুহীন সঙ্গীত শুনে ভুলে যেতে চাচ্ছে পৃথিবীর সন্তাপ, জ্বরা আর মৃত্যুকে। আবার এলিয়ট চাইছে সেই মৎস্যকন্যার সাথে সমুদ্রের নিচে বেড়াতে- যেখানে তার তুচ্ছ জীবনের মৃত্যু দিয়ে সুন্দর এক জন্মের স্বাদ সে পাবে। যেমন জীবনানন্দ নাটোরের 'বনলতা সেন' নামক নারী-প্রকৃতির কাছে পেয়েছিলেন সেই ট্রান্সডেন্টাল শান্তি। (আসলেই কি পেয়েছিলেন!)

সবশেষে কবিতাটি পাঠে তিনটি প্রস্তাবনা থাকতে পারে:

প্রথমত শুধুমাত্র এর সুপারফিসিয়াল দিকটি ধরে একজন পাঠক একে পাঠ করতে পারেন। একটি নারী পুরুষের হাতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ছে- এই রোমান্টিক মুহুর্তটির দিকে চোখ রেখে- বস্তুত যা নরনারীর ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়ঘন পরিবেশকে তথা আমাদের কোটি কোটি অর্থহীন নশ্বর সময়ের মধ্যে হঠাৎ প্রাপ্ত এমন অতি সুখের দিকটি মাথায় রেখে।

দ্বিতীয় পাঠ হতে পারে- এর ভেতরে লুক্কায়িত দুটি অভিজ্ঞতাকে- ম্যাটার(মানুষ) আর স্প্রিট(ঘুম)এর পাশাপাশি তুলনামূলক পাঠ করে। ফিজিক্যাল অস্তিত্ব পরিবর্তনশীল এবং ভঙ্গুর আর মেটাফিজিক্যাল অসীম অনন্ত। যার সাথে শেষ পর্যন্ত একটি স্প্রিচ্যুয়াল চিন্তাভাবনার যোগাযোগ আবিস্কার করা যায়।

তৃতীয় পাঠ- গ্রেকো-বিব্লিক্যাল আদি পাপকে মনে করে যেখানে মানুষ জ্ঞানফল খাওয়ার কারণে দোষী সাব্যস্ত, অশেষ দায় দায়িত্ব নিয়ে ব্যথিত এবং একটি দায়মোচনের প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে অবশেষে স্বর্গপ্রাপ্তি আশা করে। এখানে ঘুমের মাধ্যমে- সেই পাপক্ষয়ের একটি মুহূর্ত হিসাবে।

বাংলা অনুবাদ

ভালোবাসার প্রত্যাশা

তোমার নিবিড় দৃষ্টি, ভ্রু যুগোল সুন্দর নয় কোনো উৎসবের মতো
তোমার শরীরের দান আর রহস্যময়, সংরক্ষিত, শিশুর মতো নয়।
আমার কাছে তোমার জীবন থেকে যা আসবে শব্দে অথবা নিঃশব্দে
রহস্যময় উপহার হবে না সেই দৃশ্যের মতো---

তুমি ঘুমিয়ে আছো আমার হাতের পাহারায়
অলৌকিকভাবে, ঘুমের নিরাময়ী শক্তিতে আবার কুমারী তুমি
শান্ত এবং উজ্জ্বল কিছু আনন্দময় মূহূর্ত যেমন জেগে ওঠে স্মৃতিতে।
তুমি ছেড়ে দেবে তোমার জীবনের এই সৈকতকে
যার মালিক তুমি নও।

নিজেকে নিঃশব্দের কাছে ছুঁড়ে দিয়ে
আমি আবিস্কার করবো তোমার সত্তার সেই চূড়ান্ত সমুদ্রতীর
সম্ভবত তোমাকে দেখবো আবার প্রথমবার
যেমন খোদা তোমাকে দেখেন।
সময়ের কাহিনী ধ্বংস হয়ে যায়
ভালোবাসা থেকে মুক্ত, মুক্ত আমার থেকে।

২৫/০৫/২০১১

সময়ের বাইরে কবিতার ভেতরে

এমন একটি বিরতিহীন ইম্পালস কাজ করে কখনো, যে তার ভেতরে সময় শত গর্ভমুখ শত সহস্র স্বপ্ন আর সম্ভাবনা নিয়ে লুকিয়ে থাকে। সেখানে ডুব দিয়ে নতুন চোখ কান আর তীক্ষ্ণ চেতনা নিয়ে জন্ম হয় কারো কারো আমাদের। আমরা তখন আরো অন্য একটি সময়সভ্যতা চিন্তা, কল্পনা অসীমতার গহ্বর কিন্তু নতুন জন্মের ইশারা পেয়ে যাই। গর্ভ ঠিকই কিন্তু তার ভেতরে ধরে রাখা ছোট ছোট ঝিলিক, প্রতি মুহূর্তের আলোকতা, জ্ঞান-প্রজ্ঞান চারদিকের প্রতিষ্ঠিত সমাজ সংসার নয়- বরং তার শুরু, সমাপ্তিহীন অতলান্তিক চলন, তার ভেতরে ও বাইরের অসীম কালচেতনা বিহ্বল করে দেয় অনুভবের কেন্দ্রটি। আর তখন প্রাত্যহিক খোলা চোখে যে দেখা তা স্থানিক, মুহূর্তের লৌকিকতা পেরিয়ে সময়ের বাইরের অজানা অচেনাকে মাথায় জাগিয়ে দেয়- তার রূপকাঠামো ছায়াকায়া, প্রাণস্পন্দন ধরিয়ে দেয় কবিতায়। এই যে রাতদিন পাগল করা টান গর্ভের দিকে- এটির উৎপত্তি কোথা থেকে- কোন রানওয়ে পার হয়ে আসে কবিতা লেখার উড়ন্ত স্পার্ক, ফিল বা ইন্টিউশন? এই সব গূঢ় কথা না ভেবেই একদিন এই কবিতা নামক একটি প্রায় অধরা রকম ধাধাঁয় ছেড়ে দেয়া সদা পলায়নপর শিল্পকলার কাছে সমাহিত হই। আর সাথে সাথে কবে লিখেছি সেসব কবিতা, এখনো মনে পড়ে। ১৯৯৬ সাল থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত। তখন ঢাকায় থাকি। মনে আছে আজিমপুর কবরস্থানের পাশে ছোট একটি বাসায় বউ বাচ্চা নিয়ে থাকি। কাছাকাছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের পাশ দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে চলে গেছি সামনের দিকে- নিউমার্কেটের কাঁচা বাজারের দীর্ঘ সবুজে। আবার ফিরে এসেছি রিক্সা করে- যেন মহা সুড়ঙ্গ ম্যাজিকটানেল ধরে চলছি তো চলছি। আর মাথার ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ছে শত দৃশ্য, ধ্বনি, ভাবনা, অচেনা অদেখা আলো-অন্ধকারের হাওয়া- হাওয়ার সরীসৃপ বা জলহস্তী। পালাতে চাইলেও পালাতে পারছি না। বা নিজেই অপেক্ষা করছি আটকে যাবার জন্য। সেই এক পাগল দশা। বেঁচে আছি তো কবিতার জন্য মরব তো কবিতার জন্য- এরকম। কবিতার বিষয় আশয় কী ছিল তখন? ব্যক্তি, পরিবার, ইতিহাস, ইতিহাসের মানুষ, বাঙলা, বাঙালি, সিরাজদৌল্লাহ, পানিপথ, পলাশি, ধ্বংস সম্ভাবনা চেতনার ভেতরে আর এক চেতনা, শূন্যতা অর্থহীনতা বা কিছু না। খুব ব্যক্তিগত কাছের জানাশোনা চোখে দেখা বা স্মৃতি দিয়ে পাওয়া এসব। তবে এসবের বিমূর্ত রূপ আবিষ্কার চলত, কোনো কোনো সময় আপাত শৃঙ্খলাহীন ব্যাকরণ বিরুদ্ধ কবিতানির্মাণ। তখন ডাক বিভাগে চাকরি করতাম। কাজের বাইরে যতটুকু সময় পেতাম শুধু লেখালেখি করতাম- কবিতা গল্প, কবিতাই হয়ত

সবসময়। কবিতার ঘোরে সময় কাটে। আমি কবিতা নিই, না কবিতা আমাকে নেয়, লম্বা টানা সকল মুহূর্ত- ছোট ছোট সময়কতা নিবেদিত ছিল কবিতাখেলার জন্য। খেলা বললাম একারণেই যে মাথায় আসা ভাব ভাবনাকে- সেই প্রথম আসাকে- না দেখাকে- মানুষের বশে আনা বহুল ব্যবহৃত ভাষা থেকে সরিয়ে আর এক গোপন চাদরে ঢেকে পড়া- কবিতার ভাষায় প্রকাশ করার অসম কিন্তু মোহনীয় খেলা ছিল এটি। আর সেই সময়ই লেখা হল 'পলাশী ও পানিপথ' আর 'গানের বাহিরে কবিতাগুচ্ছ' র কবিতাগুলো। তারপর হঠাৎ করে বলা নেই ব্যাখ্যা নেই প্রবাস জীবন শুরু, ২য় জীবন বলা যায়। একদিন রাতভোরে আত্মহত্যার মতো একটি সময়ের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। আচমকা ছিটকে পড়লাম নিজস্ব ভাষা মা মাটি সময় অবস্থান থেকে। সেই সময় নতুন করে রুটি-রুজির ধান্দা করতে করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, পথ হারিয়ে ফেলি খুব সহজেই। কবিতা আমাকে ছেড়ে চলে যায়- দীর্ঘ সময়। আজো মন খারাপ হয় ভেবে। কে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল হায়, জানি না। সে এক আশ্চর্য ভুলে থাকার সময়, ঘুমিয়ে থাকার সময়। কি এক অপচয় আমার! অপচয় কী? আজো ভাবি। হয়ত, হয়ত না। এর জবাব একদিন পাওয়া যাবে। এভাবে চলে যায় ৭/৮ বছর, আরো বেশি হয়ত- হাজার হাজার মুহূর্ত নাম না জানা সময়সুড়ঙ্গে হারিয়ে গেল। কোনো কিছু না লিখে!

২

তো আর কতদিন ঘুমিয়ে থাকব। ঘুমোতে ঘুমোতে- জেগে উঠলাম। এই তো সেই দিন। ২০০৮ সালের শেষের দিকে, দীর্ঘ লম্বা সময়ের পর। আর এক সুহৃদ কবি বন্ধু তুষার গায়েনের সাথে কথা বলতে বলতে জেগে উঠলাম। বাতাস হয়ে গেল আমার পথ। কে যেন টান দিল মর্ম ধরে, আবার পেয়ে যাই- সেই হারিয়ে যাওয়া বাংলাদেশের সময়- একদিন যে রকম অনুভব করেছিলাম। কবিতাঘোর, মায়ের কাছে সন্তানের যেমন ফিরে যাওয়া। পথেঘাটে বিশেষ করে যখন ট্রেনে আছি, গাড়ি ড্রাইভ করছি- হঠাৎ টের পাচ্ছি কি যেন স্পর্শ করছে মাথায়, ব্রেনে, শরীরে বুকের গর্তে অবশেষে মনে। টান দিয়ে ফেলে দিচ্ছে সামনে আসা শূন্যে- অজগররাস্তায়, হাঁটছি কেন্দ্রের দিকে আবার একটু পরেই কেন্দ্র থেকে সীমানার বাইরের অসীমে শরীর মন তুলে ধরছি। রিক্সা করে ফিরে আসা সেই রাস্তা - ম্যাজিকটানেল ফিরে পেতে প্রায় দশ বছর লাগল। একটি আজিমপুর, ভাঙ্গা বাড়ি, পুরনো অলি গলি, মিস্টির দোকান, মাছবিক্রেতা ফেরিওয়ালা, রেল স্টেশন, নৌকাঘাট, স্কুলফেরা ছোট ভাইবোন ,দরোজায় দাড়িয়ে থাকা শাদা কাপড়ের মা মাতৃমূর্তি এসব ফিরে পেতে দশ বছর লাগল। নিজের ছায়াকায়া

ভেতরের আমি অনিঃশেষ পাতাঝরা হারিয়ে যাওয়া পথটি ফিরে পেতে দশ বছর লাগল! এ যেন তৃতীয় জন্ম আমার, একই আকার কিন্তু স্বাদে গন্ধে চিন্তায় ভিন্ন। চোখ মুখ মাথা রক্তচলাচল হৃদপিণ্ড সবই এক -কিন্তু অনুভব আর অন্তর্চক্ষু গেল বদলে। তাই ভাষাও গেল বদলে। দীর্ঘ শীত ঘুমের পর, যে যাত্রাটি শুরু হল তার যাত্রাবিন্দুতে ঢুকে গেল নতুন রাস্তার ইশারা। প্রথমে আসলো ছোট ছোট সংকেতের মতো কিছু, সেই স্পার্ক বা ধাক্কা- চারদিকের প্রতিবেশ বস্তু প্রাণীবিশ্ব সময় অবস্থান-এর সাথে জোড়া লাগল স্বপ্ন, সময়গতি, স্মৃতি, ইতিহাস, কল্পনাঅভিজ্ঞতা অথবা যে অভিজ্ঞতা যা কখনো আসেনি এমন আলো অন্ধকার গতি বিন্যাস সুর সাঁতার আহ্বান। আবার ভাষার নিউক্লিয়াস সেই ধ্বনি- যা বস্তুর প্রতীকে প্রথমে কোনো অবোধ শব্দে রূপান্তরিত- সেই ডাক দিল তার প্রথম স্বাদ নেয়ার জন্য। কলাকৌশলেও পরিবর্তন আসলো। যে ধ্বনিকে সাজাই, মানে দিই, একটি বিশেষ আভিধানিক শব্দ তৈরী করি- তাকে নতুন উপলদ্ধিতে ধরে সামনে এগোই। ভাষাবিজ্ঞানির যুক্তি শৃঙ্খলাকে পাশ কাটিয়ে, শুধু প্রাণ-অনুভবের টানে নির্মাণ বিনির্মাণ করেছি কবিতা আর সত্য হিসাবে আসছে এই ধারণা যে কবিতা অনুভবের বিষয়, শৃঙ্খলা দিয়ে তথাকথিত ভাষাব্যাকরণ দিয়ে এর চূড়ান্ত রূপটা পাওয়া যায়না কখনো। তাই কবিতা হয়েছে ছোট, সাংকেতিক, প্রায় নিঃশব্দে গড়া -সন্ধ্যাভাষার মতো, কখনো ইমোটিভ যা খোলামেলা নয়, লক্ষ্যভেদী, গাছের বাকলের ভেতর আরো বাকল, আকার আর স্বাদে দ্বিতীয় জন্মের মতো। ভেবে দেখলাম যারা যুক্তি শৃঙ্খলা, লাইন ভেঙ্গে ভেঙ্গে মানে খোঁজে কবিতায় তারা কী কবিতা বোঝে? আসলে কবিতা তো সেই একটি স্পার্ক থেকে পাওয়া -উৎসজাত অচেনা অজানা ভাবভাবনার মোড়কেই মাথায়, মগজে- অবশেষে একটি সমগ্রতায় ধরা যা এক সময় কাগজে অধুনা কম্পু আলোকমালায় নিসৃত। এই বিশেষ জন্মকে কোন মানবভাষায় কোনঘুণে ধরা প্রতীকী শব্দে শৃঙ্খলায় বাঁধবো? তাই ধীরে ধীরে খোলস পাল্টিয়ে মর্ম মজ্জায় নতুন বিষয় আর প্রকরণ ধরে, নতুন ভাষা উপস্থাপনায় আর গতি দোলা দিয়ে লিখছি এখনকার সব কবিতা। আর এসবই মাত্র শুর" যাত্রাপথের মাত্র আরম্ভ, সামনে আরো আছে। তার দু একটি ছিটেফোঁটা ধরে রাখতে চেষ্টা করেছি আমার প্রকাশিতব্য ৫ম কাব্যগ্রন্থ- শাদা শন্ত মেঘদল-এ। আশা করি এই বইটি বইমেলা ২০১১-এ বের হবে।

৩

মেক-আপ বক্স, রূপচর্চার বিজ্ঞাপন, পুলিশ, রিয়েল এস্টেট, অ্যানজেলিনা জোলির ঠোঁট, সংহারশিক্ষিত রাজনীতি ও লুটপাট, রাস্তা ভাঙ্গা আর নিমার্ণের

চালাকি, বাস খাদে পড়ে যাওয়া, আগুন লাগছে গার্মেন্টসে আর অজস্র অসহায় মৃত্যু, ব্যাংক ইন্টারেস্ট, মেকিং অ্যান ইন্টারন্যাশনাল আইডল ইত্যাদি শত সহস্র অবাস্তবতা আর সত্যমিথ্যা অসহ্য চালাকির মধ্যে থেকেও কবিতা লিখি(মনোহর অবাস্তব!) জানি যে কবিতা দিয়ে আমি সমাজ সংসার রাজনীতির বারবণিতা, সত্যমিথ্যা, মানুষের জন্ম মৃত্যু কিছুই বদলে দিতে পারবো না। কারণ কবিতা সবসময় মানসিক, ব্যবহারিক কিছু নয়। এর কোনো ব্যবহারিক বা বাণিজ্যিক মূল্যই নেই কারো কাছে যে রকম আছে এই টয়লেট পেপারটির। লিখছি নিজের জন্য আর সেই পাঠকের জন্য আজো যে কবিতাকে মূল্য দেয়, টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের আনন্দ সে খুজেঁ পায়না কবিতায়। শুধু লিখি না আবার নতুন ভাষার সন্ধানে দেহমন সদা জাগ্রত, রক্তাক্ত, অসীমতায় পীড়িত কিন্তু সদা সজীব, ভ্রমণরত। আজো খুঁজি সেই পথকে, নতুনকে। আর তাই এখন মূল কবিতাধারার কবিতার প্রতি মন ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ। হতাশা জাগে যখন দেখি চারদিকে কবিতার প্রচলিত স্টাইলে উপস্থাপনা, অভিধানগৃহে ক্ষয়প্রাপ্ত শব্দাবলী দিয়ে মিনার নির্মাণ আর তার সাথে সাথে কৃত্রিম মাত্রাবাজি, ছড়াশয়তানি। বিশ্বাস করি উৎস কবিতা শুরু থেকেই একটি স্বাভাবিক গতি বা তাল ও মেজাজ বা বিন্যাস নিয়ে আসে, শুধু জানতে হবে ওকে কীভাবে ধরতে হয়, বাজাতে হয়। এই মহাপৃথিবীর গতি, পরিবর্তন জীবন মরণ ক্ষয় লয় বৃদ্ধি- বিশেষত চেতনার নতুন নতুন রূপান্তর- যে অমোঘ সম্পর্ক আছে আমাদের দেহমনের সাথে- বস্তু প্রাণী আর মানুষের আর যে কালজ্ঞান আমাদেরকে ধরে রেখেছে সময়ের ভেতরে বাইরে, সেই চলন আসবে কবিতায় সেই বিকাশ ছায়া আসবে কবিতার শরীরে রক্তে। আর কবি প্রসব বেদনার মতো বুঝবে তার সৃষ্টিকালীন বেদনা যা প্রসবিত সময়ের কষ্টআনন্দের মতো। বোঝা যাবে এটি কোনো কৃত্রিম পরিবেশনা নয়- নয় কোনো কষ্টকল্পিত কৃত্রিম ছন্দ আর মহা ছড়ার দোলায় দুলিত। ব্যক্তি মাসুষের এই জীনবাহিত, সমাজ সংসার বাহিত নিরেট যুক্তি শঙ্খলার বন্ধন পেরিয়ে কবিতা তার নিজস্ব ভাবভাষায় আলোঅন্ধকারের হাড় মাংস রক্তকণিকা দেয়ালের বাইরের যে অসীমতা তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। আমি যা দেখছি যা শুনছি তাই যেন সরাসরি কবিতায় না আসে -মানে থাকবে না কোনো কিছুর ডাহা বিবরণ। আর সবাইকে স্বাভাবিকভাবে মানতে হয় যে সবকিছুরই শেষ আছে, আর তাই তার স্থলে নতুন কিছুর শুরুও আছে। কবিতা এখন আর রবীন্দ্রনাথ এমনকি জীবননান্দীয় ভাষায়ও লেখা হয় না, না হওয়াটিই স্বাভাবিক। যারা লিখে তারা হয়ত চিন্তা চেতনায় রুচি আর সংস্কারে বিশ্বাস আর ব্যবহারে এক রকম, ফেলে আসা সেই কালেরই জড়াগ্রস্ত নায়ক, বন্ধ্যা। তাদেরকে কোনো নতুন রাস্তাই আর আকর্ষণ করে না। তাই তো দেখি এই কলাকৌশল-এই বন্ধ্যা পুরনো কারিগরি নুতন কবিরা ত্যাগ

করতে শুরু করেছেন। এখন নতুন ভাষায় কেউ কেউ লিখছেন নতুন কবিতা। শুরুতেই আমার ইমোটিভ ভাষার প্রতি দুর্বলতা ছিল। আজো আছে। এটি কিন্তু আবার সেই কগনিটিভ ভাষা নয় - যা মানুষের মুখের কথা, আনন্দ, ক্ষোভ, দুঃখ, যন্ত্রণা মান অভিমানকে ধরে রাখে। এটি এরকম সরাসরি কিছু নয়। এই ইমোটিভ কাব্যভাষাতে- ইন্দ্রিয় যোগাযোগে আবেগ একটি নতুন মাত্রা পায়। এটি কোনো ডাইরেক্ট কথাকাহিনী বা কম্যুনিকেশনের দিকে যায় না। অনেক সময় মনে হয়- ভাব ভাবনার আপাত কোনো অর্থ নেই- ধরা ছোঁয়ার বাইরের কিছু। কারণ অধিকাংশ সময় এই কবিতার মেজাজ গঠন পদবিন্যাস অবৈজ্ঞানিক, বিষয়ের সাথে যুক্তি শৃঙ্খলার বিস্ময়কর গ্যাপ যা মূলত কাল্পনিক অভিজ্ঞতার দোলাচল। কিন্তু এসব নিমার্ণকে ধরা যায় শুধু সমগ্রতায় চোখ কান রাখলে। এটি আবার তীব্রভাবে লক্ষ্যভেদী হওয়ায় পাঠক আর কবির জানা ও বোঝার বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয় ধীরে ধীরে। সময় বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে মানুষের জীবন আশা আকাঙ্ক্ষা দেখা বোঝা ভালোবাসা যৌনতা বিবাহ পড়াশোনা ব্যবসা বাণিজ্য, একক ও যৌথ জীবন সব কিছুই বদলাচ্ছে। তাই কবিতার ভাষাও পাল্টাচ্ছে, পাল্টাতে বাধ্য। কেননা এটি না ঘটলে আমাদেরকে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, আমাদেরকে সহ্য করতে হবে সেই পুরনো কবিতার রিমেকিং বা রিমিক্সিং তার জীর্ণ, ক্লিন্ন, কৃত্রিম শব্দের মাত্রা ধরে ধরে সাজানো মিনার-কাঠামোকে। তবে প্রশ্ন থাকে কোনদিকে যাবে বা কিভাবে শুরু হবে? চট জলদি করে তো বলা যাবে না কেমন করে কোনদিকে। তবে আশা করা যায় -প্রথাগত কবিতাকে তার প্রচলিত বিষয়আশয়, অলঙ্কারবহুল বাগবিস্তারী কথাকাহিনী- পর্ব মাত্রা ধরে ধরে শব্দ সাজানোর কৌশলকে- যথাসম্ভব এড়িয়ে - দৃশ্য, দৃশ্যের বাইরে স্পেসের অজানা সীমানার দিকে বহে চলা একক সময়ের বাইরে তাকাতে হবে। তাহলে হয়ত অভিজ্ঞতা, চিন্তা, অনুভব, স্বপ্ন আর কল্পনাকে নতুন শব্দে ও পংক্তিতে নতুন স্টাইলে নতুন ভাষায় প্রকাশ করা যাবে।

২৫/১০/২০১০

সংঘের রবীন্দ্রনাথকে ত্যাগ করে কবি রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়

সংঘের রবীন্দ্রনাথ আর কবি রবীন্দ্রনাথ এক জিনিস না। যেমন এক না- রাষ্ট্রের প্রজানায়ক রবীন্দ্রনাথ আর কবিতার কবিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। মনে রাখা দরকার রাষ্ট্র কাউকে এত তেল মারে না যদি না রাষ্ট্র কিছু কামাইতে পারে তার কাছ থেকে। তাহলে প্রশ্ন- রাষ্ট্র এই কবির কাছে কী পায় যে তারে মানে এক কবিকে হঠাৎ একটা মহা উৎসব-আনন্দের কেন্দ্রবিন্দু করে তোলে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে রবীন্দ্রনাথের ভাবগত বা চিন্তাগত মূল্যের চেয়ে তার বানানো-মূর্তিজাত উপস্থিতির বস্তুগত মূল্য তখন বড় বেশি দরকারি হয়ে পড়ে। কারণ সেটা সামনে রেখে রাষ্ট্র তার একটা কৃত্রিম মহৎ ভাবমূর্তি তৈরি করতে পারে। সেটি করে রাষ্ট্র বোঝায় (ক) রাষ্ট্র কোনো নন্দনচর্চাশূন্য, জ্ঞানশূন্য ও অনুভবহীন ভোঁতা প্রতিষ্ঠান নয়। (খ)তার বদৌলতে রাষ্ট্রের কবি-সাহিত্যকদের প্রতি একটা সামারাটিয়ান চরিত্র দাঁড় করায়। সাথে সাথে এটির বিপুল উদযাপনের ব্যয়ভারের অংশীদার হন ঠিকাদার থেকে শুরু করে(কোনোদিন একটি মাত্র রবীন্দ্রকবিতা না-পড়া বা গান না-শুনা) বিপুল কর্মীবাহিনি। এর বাইরে যারা আছেন, তারা কবির অতলান্তিক সৃষ্টিকাজের প্রাচুর্য বিষয়ে আধ-বোঝা বা পুরাতন ছোঁয়াচে আবেগের আগুনে পুড়ে সাময়িকভাবে বাঙালি সংস্কৃতির ভাগীদার হতে চান। অন্যদিকে যারা কবিতা-শিল্পের প্রকৃত সমজদার পাঠক, তারা কবির কাছে কোনো দেওনা পাওনার হিসাব নেয় না। আবার তার মর্যাদার হেরফের পাঠকভেদেও এদিক সেদিক হয় না। সে ততটুকুও নেয় যতটুকু কবি দিতে পারে বা যতটুকু মূল্য একজন কবি বা সাহিত্যক তৈরি করতে পারে পাঠকদের কাছে। এর মধ্যে কোনো বস্তুগত লাভের হিসাব নিকাশ নাই। প্রকৃতপক্ষে সংঘের রবীন্দ্রনাথ একজন নেতা রবীন্দ্রনাথ হিসাবেই আবির্ভূত হোন- যার ভেতরে সংঘকর্মীরা আবিষ্কার করেন এক অভূতপূর্ব কবি আর সংগীতের মর্মবাণী যা দিয়ে একটা রাজনৈতিক শিক্ষার কর্মসূচি হাতে নেয়া যায়। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ যে একটি প্লুরালসৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব সেটির কোনো অস্তিত্ব থাকে না, থাকে শুধু বাহুবলীয় সিংগুলারিটি -যার মাধ্যমে চিন্তার স্বাধীন স্রোতটাকে থামিয়ে দেয়া সম্ভব।

সংঘের রবীন্দ্রনাথকে যারা সঙ্গী করে তাদের মানসিক জগৎ থেকে কবি সাহিত্যিক 'রবীন্দ্রসঙ্গ' অনেক আগেই লুপ্ত। যা থাকে সেতো এক নাম না জানা বিস্ময়! যার আর এক নাম হতে পারে অজ্ঞ বা অন্ধ বিস্ময়। তারা তখন হাজার নেতার পাশাপাশি বা কখনো ছায়াতলে নতুন নেতা রবীন্দ্রনাথকে পায়। এখানে তাই প্রশ্ন আসে রবীন্দ্রনাথ কিসের নেতা? রবীন্দ্রনাথের আইডোলজি কী?

রবীন্দ্রনাথ কী করে তাদের সাথে? রবীন্দ্রনাথের ম্যাসেজ কী? তার যে অন্যায় হিংসা, বিদ্বেষহীন সমাজের ধারণা, কল্যাণের চিন্তা, সার্বজনীন শিক্ষার চিন্তা, সেগুলি কোনো একটি দলের বা দলীয় নেতা কর্মীদের আইডোলজি না, এইগুলি ইউনিভার্সেল এবং সার্বজনীন ও সর্বকালীন। এইগুলি সংঘের লোকেরা নেয় না বা তারা এভাবে চিন্তাও করে না। কারণ সেগুলিতে তাদের কোনো ফায়দা নাই বরং তাতে কবি রবীন্দ্রনাথের বাণিজ্যবিহীন, নিরীহ কবিমুখটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিষয়টা ভেবে দেখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ তো কারো নেতা না। কারণ কবির কাজ কোনো নেতৃত্ব বিধান বা কোনো নির্দেশ দান না। কবির কাজ মানুষের ভেতর মরে থাকা সৌন্দর্যবোধ জাগানোর মাধ্যমে জীবনকে একটা মিনিং দেয়া, মানুষের ভেতর চিন্তাহীন, শুধু ভোগবাদী পশু সত্তাটাকে বাদ দিয়ে তাকে মানুষের কাতারে আনার জন্য তৈরি করা।

সংঘের কোনো স্থির চরিত্র নাই। নানান রকম মানুষ নিয়ে সে যে একটা কিছু হয় সেটি আসলে একটা বহুরূপী বহুগামী স্থির আকারহীন চরিত্র। তার অবলম্বন বহিরাঙ্গনের নীচ রাজনীতি ও তৈলমর্দন। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথ আসলে কোনো বহিরাঙ্গনের লোক না। তাই ঘটা করে মজলিসি কায়দায় রবীন্দ্রনাথকে-রবীন্দ্রনাথের মুর্শিদ আর মুরিদ ধরে তার সংগীতের মজা পাওয়া যায় না। কারণ নিসঙ্গতাই আসল রবীন্দ্রনাথ। কবিতাশিল্প বা নন্দনচর্চা ঠিক কোলাহল, প্রভাতফেরি, নেতা নেত্রি পাজামা পাঞ্জাবির বিষয় বস্তু নয়। এইগুলি লোকের নিসঙ্গতাকে দাবী করে। সংঘবল আদতে একটি বাহুবলের চাতুর্যমাত্র। এর কারুকার্যময় পৃথিবীর ভেতরে বেচারা কবি রবীন্দ্রনাথ পালিয়ে বাঁচে যেন। সেই সূত্রে বলতে পারি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে পূজা করা আর তার সাহিত্যসৃষ্টিকে সমাদর করা এক জিনিস না। যারা ব্যবসায়িক, বা রাজনৈতিক কারণে তাকে পালন করে, তারা তার স্রষ্টা-সত্তাকে হত্যা করে বাজারি রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দেয়। বাঙালির হাজার বছরের মনোভঙ্গি হিরো-ওয়ারশিপিং হওয়ার কারণে সমাজ চিন্তক, রিফর্মনিষ্ঠ, মানবতাবাদি রবীন্দ্রনাথের দর্শনেরও কোনো চর্চা হয় না। সাদা কাপড় আর সাদা গোঁফদাড়িওয়ালা কবিকে বৈশাখ আর শ্রাবণের রোমান্টিক দেবতা করে দাশেরা ফুলের মালা আর কথার ফুলঝুরিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এতে হয় না কোনো বিচার বিশ্লেষণ, হয় না কোনো জীবনকে বোঝার বা জানার অন্বেষণ। তাহলে ক্ষতি কার প্রজানায়ক রবীন্দ্রনাথের না কবিরাজ রবীন্দ্রনাথের? না সংঘবাদী এইসব ক্ষুদে নায়কদের?

আমার মতে ক্ষতি তিন দলেরই। কারণ এতে তারা কোনো কিছু বুঝতে পারে না। আর বুঝতে পারে না বলেই কোনো কিছু গড়তেও পারে না। এই একই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে স্টেজে, হলরুমে বা লম্বা করিডোরে কিংবা কোনো বাগান বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ছবি টাঙ্গিয়ে, রবীন্দ্রচর্চার নামে তার নাম জপ করা ধর্মবাদীদার সমতুল্য। তখন এই ধর্ম গুরুকে পাবলিক যীশুর মতো শৃঙ্খলিত করে লোকজনের কাজ থেকে দূরে নিয়ে যায়। আটকে রাখে বড় বড় দালান কোঠায়। রবীন্দ্রনাথ ধর্মেও নাই, অধর্মেও নাই। রবীন্দ্রনাথ আছে নিসঙ্গ ধ্যানে, পুরষের সমাধিভঙ্গিমায়। হিরো-ওয়ারশিপিং মানসিক পুঙ্গতার কারণে হিরোকে নানান ভাগে বিভক্ত করার প্রচলন বাংলাদেশে আছে। রবীন্দ্রনাথকে ভেঙ্গে বিশ্ব কবি, হিন্দু, বাঙালি, ভারতীয়, এপার- ওপার বাংলার নেতা বানানোর মাধ্যমে সৃষ্টিহীন লোকদের একটা হীন উদ্দেশ্য সফল হয় হয়ত। তাতে কবি সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের কিছুই হয় না। কবি রবীন্দ্রনাথ সব সময় এক এবং নিসঙ্গ রবীন্দ্রনাথই থাকে। তাকে পাইতে হলে তাকে ঘরে বসেই তার সৃষ্টিশীলতাকে তথা তার টেক্সটকে পঠন, বিশ্লেষণ আর পূর্ণঘঠনের মাধ্যমে পাইতে হবে।

২৩/০৫/২০১২

কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেন স্মরণে রচিত : এক আত্মবিশ্বাসি দ্রষ্টা-কবি

‘পৃথিবীর সর্বশেষ কবি আমি অহংকার আমার কবিতা’

খোন্দকার আশরাফ হোসেন তার দীর্ঘ কবি-জীবনে কবিতার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেছেন। একদম ব্যক্তিগত কবি-জীবনের আবেগ কামনা বাসনা বিষণ্ণতা থেকে শুরু করে (তিন রমণীর ক্বাসিদা, পার্থ তোমার তীব্র তীর) ইতিহাস ঐতিহ্যের স্মারকচিহ্ন (বেহুলা বাঙলাদেশ, যমুনাপর্ব) এবং আয়না দেখে অন্ধ মানুষ (মিস্টিক) পর্যন্ত নতুন নতুন কাব্য ভাবনা, বিষয় আশয়ে নিজেকে উজাড় করেছেন। এই যাত্রা ঘটেছে তার আত্মপরিক্রমণের সাথে সাথে, কবিতার নতুন পথ অনুসন্ধানি ভ্রামণিক চোখের প্রখর কিন্তু একটি আত্মমগ্ন দৃষ্টির সাথেই। খোন্দকার নিজেকে একটি ককুনের মতো প্রথমে গুটিয়ে রেখে ধীরে ধীরে সমাজ সংসার, মানুষের কীটদষ্ট মানসিকতা, তথা কালের কৃপাণে ধরা জীবনের কুলষিত চরিত্রকে আঁকতে বা কখনো আক্রমণ করতে চেয়েছেন। এতে তার হৃদয়ে রক্ত ঝরেছে অবিরত, তিনি একা থেকে আরো একা হয়েছেন, নার্সিসাসের মতো অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছেন শূন্যতার সিম্ফনি-স্রোত। তাই তার কবিতা পাঠে কখনো আমার কাছে মনে হয়েছে একজন বুদ্ধ-ধ্যান মনস্ক কবির সেল্ফ রিয়েলাইজশেনের সাথে সাথে প্রতি মুহূর্তের সামাজিক ইন্টারপ্রিটেশন, ব্যক্তি আর সংগঠনের ভেতর লুকিয়ে থাকা অদৃশ্য মুখোশের আবিষ্কার তিনি করে চলেছেন। কিন্তু তাই বলে তিনি উচ্চকণ্ঠের কবি নন কখনও। তার বলা মৃদু স্বরের, তার আহ্বান কোনো এক সন্তের আহ্বান, যার ধ্যান আর চিন্তা থেকে বের হয়েছে কবিতার থরো থরো আলো। আবার তার এই আপাত বিষণ্ণতা তার কণ্ঠকে মাঝে মাঝে রক্তাক্ত করেছে বটে, তিনি বেদনার শরে তীরবিদ্ধ পাখির মতো কেঁপে উঠেছেন, কিন্তু তা কখনই মৃত্যুকামী কোনো অবসেসড, মেলানকোলিক, বিষাদগস্ত কবির মরবিডিটি নয়। বরং তার ভেতরের একটি বৌদ্ধিক তথা অ্যাম্পেথেটিক মানসিকতা কাজ করেছে। তাই তিনি এই আগ্রাসি হিংস্র সভ্যতাকে করুণা আর ভালোবাসার বাতাবরণে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

খোন্দকার শুরু করেছেন একদম নিজেকে তৈরি করেই, একটু দেরিতে হলেও। কবি ছিলেন ভেতরে ভেতরে, সমাহিত ছিলেন সৃষ্টির পাতালভূমে। সৃষ্টি যখন চলছে মনের গহীনে লিখিত প্রকাশে কী এসে যায়! তার সমসাময়িকেরা যখন

কালের কোলাহল, সমাজের চলতি হা্ওয়ার হালকা স্থূল বিষয়-ভাবনার কবিতা নিয়ে অনেকটা বিজয়ীর দেশ দখলের সার্থকতায় হাসি মেলে ধরেছেন; কখনো শামসুর রাহমানীয় তালিকা করণের পদ্ধতি কখনো আল মাহমুদীয় মাটি ও কাদার বা নারী মাংসের কাঁচা গন্ধ শোকার প্রতিজ্ঞা করে কবিতার পর কবিতা সাজিয়েছেন, খোন্দকার তখন সেই অপেক্ষাঋদ্ধ, কবিতার সঠিক টিউন চিহ্নকরণের হাতটিকে শক্তিশালী করেছেন। ফিরে গেছেন বাংলা কবিতার মৃন্ময়ী, ইতিহাস ঐতিহ্য আশ্রিত ধারাটির সাথে। কবিতায় এনেছেন ভাব আর ফর্মের সংহতি, সৃষ্টি আর প্রকাশের জাদু। তলে তলে আহরণ করেছেন ধ্যানির স্থির দৃষ্টি, প্রজ্ঞাবান ঋষির ভিশন। নিজেকে কবিতার বেদিতলে সঁপে কুড়িয়ে ফিরেছেন এর বাল্মীকিয় ভাষা আর প্রকাশের প্রাতিস্বিক উচ্চারণ। আর তার এই সৃষ্টি-কৌশল আশির দশকের সমস্ত কবিকেই যেন দিয়েছিল নতুন পথের সন্ধান।

সব কবিরই একটি বিশেষ ট্রেডমার্ক থাকে যা তার নিয়তি হয়ে যায়। আমার মনে হয়েছে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের ট্রেডমার্ক হতে পারে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতার 'সন্ত কবি' হিসাবে। আমার কাছে যে খোন্দকার আশরাফ হোসেন আজো তীব্র অহংকার আর আহ্বান নিয়ে বারবার ফিরে আসেন তার উপস্থিতি জানান দেন, তিনি হলেন সেই আত্মমগ্ন সন্ত কবি। যিনি শুধু কবিতা-সৃষ্টিবীজ রহস্যের জাদুতে দেখতে চেয়েছেন আপনাকে, এই পৃথিবীকে।

আমাকে পাবে না প্রেমে, প্রার্থনায় নম্র হও পাবে,
কামে-ঘামে আমি নেই, পিপাসায় তপ্ত হও পাবে।

পাখিরা প্রমত্ত হলে সঙ্গিনীকে ডেকে নেয় দেহের ছায়ায়–
ছায়া নয়, রৌদ্রতাপ জ্বালাবার শক্তি ধরো, কেবলি আমাকে
তপ্তজলে দগ্ধ করো, রুদ্ধ ক্রোধে দীপ্ত করো, পাবে।

পৃথিবীর সর্বশেষ কবি আমি অহঙ্কার আমার কবিতা
বিষাদে বিশ্বাসে পূর্ণ হৃদয়ের জলাধারে ধরো,
আমাতে নিবদ্ধ হও পূর্ণপ্রাণ ফলবন্ত হও–
আমাকে পাবে না ফলে, পরাগ-নিষিক্ত হও, পাবে।
–প্রার্থনায় নম্র হও পাবে

এ কথা সত্য যে তার কবিতায় ধীরে ধীরে সমাজ সংসার, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সবই এসেছে। তিনি বেশিদিন আত্মমগ্ন থাকতে পারেন নি। যে দেশ রক্ততাড়িত, যে দেশে মুক্তিযুদ্ধ নামের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ঘটনা ঘটেছে, যে দেশে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বার বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, যে দেশে নুরজাহানের মতো অসহায় মেয়েকে মধ্যযুগীয় কায়দায় পাথর ছুড়ে মারা হয়েছে– সে দেশের কবি নিজের প্রকোষ্ঠে তো বেশিদিন বন্দী হয়ে থাকতে পারেন না। খোন্দকার কবিতায় এসব বিষয় এনেছেন, তা যে সব সময় কবিতার আরাধ্য সেই শিল্পসুষমাকে তার প্রাপ্র্য মিটিয়ে দিয়েছেন তা তো নয়। কিন্তু বিষয়গুলি ঘটেছে তার সেই ট্রেডমার্ক ভঙিমায়– নম্র, নমিত, মগ্ন আর ঋষিসুলভ নিম্ন স্বরে। এইখানেই খোন্দকারের বিজয়, কবিতার জয়। আমার ব্যক্তিগত পছন্দের তালিকায় কবির প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'তিন রমণীর ক্বাসিদা' এর সেই আল্টিমেটাম– 'পৃথিবীর সর্বশেষ কবি আমি অহংকার আমার কবিতা' সেই অহংকারি কিন্তু প্রতিশ্রুতিশীল, ঘোষণাবিদ্ধ কিন্তু কবিতার নিজস্ব বসতবাড়িতে ফিরে আসার মন্ত্রসম উচ্চারণই একটি গাঢ় আসন নিয়ে বসে আছে। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমি যে কবিতার কথা চিন্তা করি আদর্শ হিসাবে, তারই একটি রূপরেখা যেন পাই এই কবিতায়। যেমন এর সংহত উচ্চারণ এর মিতকথন, এক সৃষ্টিশীল নির্জন কবি-সত্তায় প্রবাহিত 'কবি-আমি'র ঘোষণা এবং সর্বোপরি সত্তরের পয়েটিক ফ্যালাসি সেই সর্বব্যাপী আত্মভূক ন্যারেটিভিটি এবং তার সাথে আসা উদ্দাম তরলতাকেই যেন একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত করল এই কবিতা।

এই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ-- প্রার্থনা, পিপাসা, দগ্ধ, বিষাদ, বিশ্বাস, হৃদয়ের জলাধার, নিবদ্ধ, পূর্ণপ্রাণ ফলবন্ত, পরাগ-নিষিক্ত, বিষাক্ত আঙুর, এবং রক্তরস যিশুর রুধির ইত্যাদি যে প্রতিবেশ তৈরি করে এতে করে আমরা দুটি ধারণায় আসতে পারি। এক. কবির কাজ হলো সৃষ্টিশীল ধ্যান-মগ্নতা; আর দুই. কবি এমনভাবে নিজেকে ব্যবহার করেন যে কবি হয়ে পড়েন যীশুর ক্রুশবিদ্ধতার জীবন্ত প্রতিকৃতি। কবিতার প্রতি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের নিবেদন, তার একনিষ্ঠ চর্চা যেন বাংলা সাহিত্যের তথা বিশ্ব কবিতার সৃষ্টিশীল ঝোঁকটাকেই অংকিত করে। কারণ প্রকৃত কবিতা চায় কবির সম্পূর্ণ সমর্পণ, সৃষ্টির সাথে এক হয়ে যাওয়ার একাগ্রতা। 'আমাকে পাবে না প্রেমে' 'কামে-ঘামে আমি নেই' কিন্তু 'প্রার্থনায় নম্র হও পাবে, পিপাসায় তপ্ত হও পাবে' অবধানের মধ্যে ধ্যান আর সৃষ্টির যুগপৎ নিরাসক্তি আর সাবমিশনের সাবলিমিটিকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এখানে ব্যক্তি খোন্দকার আর ব্যক্তি থাকেন না, তার পরিচিতি তার আর্তি পৃথিবীর সকল সৃষ্টিশীল কবির আত্মাতেই যেন বিলীন হয়ে যায়।

কবির সফলতা শেষ পর্যন্ত কবিতার সফলতাই। মানে কবি তার পোয়েটিক অ্যাসপিরেশনের নামে কেবল কোনো দায়িত্ব কর্তব্যের বা সমাজস্বীকৃত কোনো নৈতিকতাবোধে আটকে থাকেন না। যদি থাকেন তাহলে তার কবি-প্রতিভার অকাল মৃত্যু ঘটে। কারণ কবিতার কাজ মানুষের নীতিবোধ মানুষের দর্শন শিক্ষা বা প্রচার নয়। এভাবে তার উদ্দেশ্য পাঠক মনোরঞ্জন নয়, বরং পাঠকের পাঠশক্তিকে জাগিয়ে তোলা, তার পাঠবীক্ষাকে পরীক্ষা করার জন্য তার কবিতায় তিনি বোধ আর বিস্ময়ের, অজানা আর অনিশ্চয়তার পৃথিবী খুলে ধরেন। কবি লিখবে তার জন্য, কবিতার জন্য প্রথমে। যদি কেউ তার অভিজ্ঞতার সাথে নিজেদের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে নিতে চায় তাহলে সেটি হবে কবির বাড়তি পাওনা। পৃথিবীর সর্বোত্তম কবিতাগুলি এই কথাই বলে। সেই কারণে কবিতার আধার কোনো সত্য মিথ্যার আধার নয়, নয় কোনো সামাজিক রাজনৈতিক আন্ডারটেকিং। এটি একটি স্বাভাবিক আর্তি, একটি স্বয়ং প্রকাশ যার মাধ্যমে কবি তার ভেতরের পাওয়া ভিশন আর স্বপ্নধ্বনিকে কাব্যরূপ দেন। একজন কবি তার দেশ সমাজ সবকিছুকেই কবিতায় ধারণ করতে পারেন কিন্তু এর কবিতার দায়টুকু মিটিয়ে না দিলে যেন সেই কবিতা আমার কাছে অনেক দূরে সরে রইল। যুদ্ধ করা কবির কাজ নয়। এ কথায় অনেকেই দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। কিন্তু ভেবে দেখা যায় কবিতায় কেউ কি কোথাও কোনো বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে? কোনো দেশ কি স্বাধীনতা পেয়ে যায় কবিতার জন্য? কবিতার প্রাণ তার নিজস্ব হয়ে যাওয়াতে, সমাজ রাজনীতি, সংঘ আর সংগঠনের উত্থান বা পতন প্রকাশ ব্যতিরেকেই। কবিতার ভাষা কবিতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে শুধু। তাই যেন ঘটেছে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিন রমণীর ক্বাসিদা'য়। তিনি এখানে হাজির হয়েছেনে সম্পূর্ণভাবে একজন কবি হিসাবেই। তার ভেতরে দেশ আছে, আছে ইতিহাস ঐতিহ্য কিন্তু কখনোই তা তার কবি সত্তাটিকে তথাকথিত দায়িত্ববোধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখেনি। বাংলাদেশের কবিতার ইতিহাসে এই কাব্যগ্রন্থটির পাঠ বিভিন্ন কারণে জরুরি হয়ে থাকবে। এর আগে কবিতায় কবিতার সত্তা তার মাধ্যাকর্ষণ থেকে চ্যুত হয়ে চারিদিকের সামাজিকতা আর রাজনৈতিকতার একটি মেটা-ন্যারেটিভিটির দিকে রওনা হচ্ছিল। খোন্দকার সেখানে আনলেন একটি কন্ট্রোল, এঁকে দিলেন কবিতার রেলিজিয়ন তথা রহস্যের উল্কি। ফর্মকে দিলেন রাজকীয় অধিকার, কথা আর ভাষ্যে আনলেন পরিমিতি, পঙ্‌ক্তিতে রাখলেন স্বপ্ন– বোধতাড়িত চকিত উপলব্ধি।

তার ‘সর্বশেষ কবি আমি’ বলার পেছনে আমার আবার মনে হয়েছে এখানে কবির দুটি উপলব্ধি কাজ করেছে। ১. কবিতা অপচয়িত হয়েছে, ২. কবিতাকে অকবিতা থেকে মুক্তি দিতে হবে। তাহলে কবিকে কী করতে হবে? তিনি কবিতায় তুলে আনলেন ঋষিসুলভ তান্ত্রিকতা, যেখানে শুধু কথা সাজানোর তালিকা নয়, কোলাহলের বিচরণ নয়, নয় রাস্তায় রাস্তায় মিছিল শেষে গলা বাজানো কোনো নেতার কথা শুনতে আসা কবির কলমের বীরগাথা। তিনি কবিতার পক্ষে নেমেছেন, নেমেছেন কবির পক্ষে ‘আমাকে পাবে না প্রেমে, প্রার্থনায় নম্র হও পাবে, কামে-ঘামে আমি নেই, পিপাসায় তপ্ত হও পাবে। ’ এমন কি কবিতা পাঠ আর পাঠকের একটা নতুন কারেক্টার দিতে চাইছেন। পাঠককে তিনি জাগিয়ে দিতে চাইছেন। চাইছেন তাকে কবির মগ্নতার সহগামী হতে।

এই কবিতা পাঠ শেষে কেউ কেউ এই ধারণায় আসতে পারেন– একটা বাল্মীকীসুলভ উচ্চারণ এক সময় কবিকে পেয়ে বসে। এটি নিজেকে নিঃশেষ করে ভেতরের এক ঘোরলাগা সৃষ্টি সময়ের কাছে টোটাল অ্যানিহিলেশন যেন। মানে একটি ফানাবিল্লাহ-মুহূর্ত। যুগ সন্ধিক্ষণের বন্ধ্যা-কবিতা-জমির ওপর দাঁড়িয়ে কবি তার ভিশন পাওয়া শ্লোকবাক্য তথা নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করেন। কবির গর্ভ তখন কবিকেই জন্ম দেয়, নতুন কবিকে। বাংলা সাহিত্যে কয়েকবারই এসেছে এই ঘোষণা। একবার কাজী নজরুল ইসলামের ‘বল বীর বল উন্নত মম শির’ আর একবার জীবনানন্দ দাশের ‘কেহ যাহা জানে নাই.. .. কোনো এক বাণী.. .. আমি বহে আনি.. .. আমার মতন আর নাই কেউ’। এইসব উক্তিতে দুটি আইডিয়া থাকে। ১. পুরাতন কবিতার যুগ শেষ, নতুন যুগের শুরু; ২. কবি আছেন কিন্তু কবি একা। নজরুল যেখানে দ্রীপ্ত, গমগম করা কণ্ঠস্বরের জানান দেন, জীবনানন্দ সেখানে নির্জন একাকিত্বের ঘোষণাকারী হিসাবে আসেন। খোন্দকার আরো এক ধাপ এগিয়েছেন। তিনি কবিকে তার স্বমহিমায় মানে তার আত্মমগ্নতার শীর্ষ আরোহণের পথটিকে আমাদের সামনে খুলে দিয়েছেন। তার আহ্বান ‘প্রার্থনায় নম্র হও পাবে’। এই প্রার্থনায় আমরা কবির সেই আদিরূপটিকেই দেখতে পাই। এ যেন কবি আর কবিতার নতুন জন্ম।

খ.
‘তিনটি রমণী বসে বুকে আঁটে ছায়ার বোতাম’

কবির কাজ শুধু ভাবনাকে বিবরণমুখী করে তোলা নয়। তার আত্মমগ্নতার শীর্ষ চূড়া থেকে যে আলো ভাষার পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে সেখানে যেমন ব্যক্তি-বোধের সত্য-মিথ্যা ঝলসে ওঠে, তেমনিভাবে আরো একটি রশ্মি আগামীদিনে যা ঘটতে পারে বা হতে পারে তার বার্তা নিয়ে আসে। কবি সচেতনভাবে যে এটি করেন তা নয় বরং তার দ্রষ্টা-গুণ প্রবল হলে এক সময় হীরক উজ্জ্বল কিছু মুহূর্ত আয়নার মতো প্রতিবিম্বিত হয়ে যায়। খোন্দকার আশরাফ হোসেন একাধারে আত্মমগ্ন, সন্ত ও বহির্মুখী কবি। তিনি এক সময় ডুব দিয়েছেন ভাবের যমুনায় অন্য সময় ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই বাউসি ব্রিজের মুক্তিযোদ্ধার পায়ে পায়ে। দেখছেন সন্তানেরা উড়ে যাচ্ছে পাশ বালিশের তুলোর মতো, জীবনকে মাপতে চেয়েছেন জীবনের সমান চুমুকে। কিন্তু তার উপরিভাগের ভ্রমণ ক্ষণিকের তরে। ঋষিসুলভ আত্মমগ্নতাই তার কবিতার প্রধান দিক বলে আমি মনে করি। আর সেখানেই তিনি কখনো কিছু ভিশনের মুখোমুখী হন, তার কলম থেকে বেরিয়ে আসে ধ্যানমগ্ন ঋষির শ্লোকগাথা- যেখানে অতীত-বর্তমান আর ভবিষ্যতের সীমারেখাটি বিলুপ্ত হয়, টনটন করে বেজে উঠে আত্মমগ্নতার সংগীত। বাংলাদেশের কবিতায় এই জোনটি তেমন দেখা যায় না। কবিরা শুধু যা বোধ করেন বা দেখেন বা যা হয়েছে সেই ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে আঁকেন, কখনো উপলব্ধিকে বেশ ন্যারেটিভের অতিকথনে জর্জরিত করে ফেলেন। খুব কমই দেখা যায় যেখানে কবি একজন দ্রষ্টা, একজন ভিশনপাওয়া মুহূর্তের লেখক। তার ধ্যান মগ্নতায় পাওয়া বস্তু আর বস্তুর ভেতরের গুণ- কখন যে স্তব্ধতার বাইরে চারদিকে এক মগ্নতায় ছড়িয়ে পড়ে- তিনি তা অনুভব করতে পারেন। অভিজ্ঞতাকে ভাষায় ধারণ করা আর তাকে বর্ণনার কারুকার্যে লিপিবদ্ধ করার জন্য কবির অতিব্যবহৃত, সৃষ্টিহীন ভাষাজ্ঞান জরুরি হয়ে পড়ে- যেখানে একটি গোপন ফাঁকির কাজ থাকে। কবির প্রতিবিম্বে তখন কবি বহির্বাসী, অচেনা। কারণ তখন তার ভেতরের প্রথম ভাবনাটি স্তরিভূত হয় না। কবি হয়ে পড়েন কোনো সত্য ঘটনার লেখক, ইতিহাস-প্রবণ। তখন তার কাজ হয়ে পড়ে সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি, ধর্ম, নীতিকথা ইত্যাদি- অতিচেনা, ইতোমধ্যেই ভাষায়িত কমনসেন্সের বিষয়াবলি নিয়ে কবিতা লেখা। তখন তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ, তার দায়িত্ব হয়ে পড়ে বিষয়কে বা বস্তুকে বিবরণ করা, মানুষের রুচির সাথে তাল মিলিয়ে, মানুষের প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধের কাছে দাঁড় করানো। সেইসব লেখা পাঠককে মোটেই ভাবায় না, পাঠককে প্ররোচিতও করে না, পড়ার পরই শেষ হয়ে যায় তার আবেদন।

কিন্তু কবি যখন দ্রষ্টা তখন তার কবিতা আগমন ঘটে শ্লোকের মতো, ভাষা তখন তার দ্রষ্টা সত্তার বাহন হয়, তিনি ভাষাকে পরিচালিত করেন, ভাষা তাকে নয়। তার উচ্চারণ হয় তখন প্রায় অটোমেটিক। এই যে প্রাপ্তি, এই প্রাপ্তি তার জন্য একটি প্রফেটিক ব্যাপার। এখান থেকে যে কবিতার বিচ্ছুরণ ঘটে সেখানে কবির অঙ্গীকার থেকে প্রধান হয়ে পড়ে তার আত্মোপলব্ধি তার আত্ম-দর্শনের ম্যাজিক মুহূর্ত। এমনটিই ঘটেছে খোন্দকার আশরাফ হোসেনের 'তিন রমণীর ক্বাসিদা' নামক কবিতাটিতে। এই কবিতাটি আমাকে এক সময় ম্যাকব্যাথের সেই তিন ডাইনির কথা মনে করিয়ে দেয়। হতে পারে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বলে, ম্যাকবেথ পড়ার কারণে সেই 'ডাইনি' ইল্যুশনটি তার ভেতরে কাজ করতে পারে। কিন্তু খোন্দকারের ভিশনটি ঘটেছে একটি বাঙালি আবহে, বাংলাদেশের জল, মাটি, আকাশ আর বাতাসে। এটিতে রাজনৈতিক মেজাজের চেয়ে বেশি বেজে উঠেছে আশির দশকের এক কবির নীরব কিন্তু ট্রেডমার্ক বাহিত- আত্মবিশ্বাস আর আত্মমগ্ন কবিতার ঘরে ফেরে আসার টান টান যাত্রাধ্বনি। এটি যেন এক কবির ব্যক্তিগত লড়াই, লড়াই অস্বীকৃতি আর অবহেলার বিরুদ্ধে, লড়াই জমে যাওয়া পুরনো হয়ে যাওয়া ক্লিশে বিবরণধর্মী এক কাব্য ভাষার বিরুদ্ধে। খোন্দকারের পাশাপাশি তার সমসাময়িক আরো অনেকে ছিলেন কিন্তু যেহেতু তার ধীর-প্রকাশ, তার পতাকা উত্তোলন অপেক্ষাকৃত দেরিতে ঘটেছে তাই তাকে কবি জীবনের এই রক্তকালটির ভেতরে প্রথমে শহীদ হতে হয়েছে।

তিন রমণীর ক্বাসিদা কবিতাটি আসলে একটি জার্নি কবিতা। কবির ভিশন পাওয়া মুহূর্তের তিন ধাপের খণ্ড খণ্ড মানসিক জার্নি। কবিদের ফিজিক্যাল/মানসিক জার্নি ঘটে, জীবনানন্দ জার্নি করেন লেখেন- বনলতা সেন, রবীন্দ্রনাথও জার্নি করেন, লেখেন- শত শত কবিতা গল্প উপন্যাস। বনলতা সেনের জার্নি একটি ব্যক্তিগত জার্নি হয়েও আজ বহুবাচনিক এবং বাংলা কবিতার একটি ঐতিহাসিক মাইল ফলক। মূলত এটি কবির শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের সময়ে দু-দণ্ড শান্তিলাভের আশায় প্রকৃতি নামক এক নারীর কাছে নিজেকে সমর্পণ। তাতে হাহাকার আছে, আছে পূণর্জন্মের আশা। কিন্তু জীবনের ভিশন পাওয়া আচানক প্রতীতিগুলোর দেখা পাওয়া যায় না। সময় আর সময়ের ভেতরে ধরা আর ব্যক্তি বিশেষের মগ্নতায় ডুব দেওয়ার গহীন গভীর ধারাগুলো দেখা যায় না। মানুষের জীবন আর সময় পাল্টানোর সাথে সাথে, সভ্যতার সাথে সাথে কবির জীবনের চিন্তা আর ভাষার পরিবর্তন ঘটে। আশি দশকের কবি খোন্দকারও এই জলে পা ডুবিয়ে দেন। খোন্দকারের এই জার্নি যেন সেই কাহিনির দরবেশের মতো-

যেখানে স্থির থাকার মধ্যেই তার আত্মদৃষ্টি বিকশিত হয়, ধীরে ধীরে এক অনন্য আপন-কেন্দ্রীকতায়, এক ধ্রুব শূন্যতায় তাদের ধ্যানের চূড়ান্ত অনুবাদ হয়। তার ভিশনপ্রাপ্তি ঘটে, তিনি ধাপে ধাপে সমর্পণ, নিষ্পেষন ও সব শেষে-আত্মোপলব্ধিতে নিজেকে স্থাপিত করেন। শক্তিশালী কবিদের এই ভ্রমণ ঘটে তাদের সেই কবি হওয়ার জন্মকালীন সময়েই। তখন সে কেবলি ধারক, এক ডাইনি শাসিত সময়, এক অসীম গহ্বর খচিত সভ্যতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি তখন কেবলি কবি- দ্রষ্টা। তার প্রাণ থেকে বের হয়ে আসে থরো থারো আত্ম-উপলব্ধির বাক-বিভূতি।

কবিতাটির দিকে আরো একটি গভীর দৃষ্টি দেওয়া যাক। এই কবিতাটি একটি ছোট একাঙ্কিকার মতো, তিনটি ধাপে সাজানো। এর পাত্র-পাত্রী তিন রমণী আর কবি নিজে। এছাড়াও আরো কিছু ইশারা আছে। একটি ইশারা যেন বাংলাদেশের একটি আত্মঘাতি সময়কে মনে করিয়ে দেয়। যেদিন এক দঙ্গল হিংস্র নেকড়ে ছিঁড়ে খুটুড়ে খেয়ে ফেলেছিল বাঙালির জাতীয় বীরকে, মুক্তিযুদ্ধের মহান নায়ককে। কিন্তু কবিতাটি শেষ পর্যন্ত এক তরফাভাবে একটি রক্তপাতের কথায় শেষ হয় না।

শেক্সপিয়ারের বিয়োগান্তক নাটকের নায়কদের মতো মানুষ নিজেই নিজের পতনের বীজ নিজের কাছে ধরে রাখে। মানুষের নিয়তি হয়ত তাই। এইখানেই প্রথম আমরা দেখি খোন্দকার তার রাজনৈতিক অঙ্গীকারের বিষয়টি জানান দেন, পরবর্তী সময়ে যা ধীরে ধীরে তার কবিতার একটি অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে পড়ে। সময় আর সভ্যতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের আর্তি মানুষের মৃত্যুমুখী মুখ প্রবলভাবে ভাষা পেয়ে যায় তার কবিতায়।

কারা নাকি রাজা হবে, কারা হবে রাজার জনক;
গর্গনের তিন মেয়ে চুলে ওড়ে সাপের ছোবল,
কানে গোঁজা কম্রফুল, পদতলে রতি শঙ্খচূড়;
'দেখা হবে পুনর্বার', বলে ওঠে তারা আচানক।

'এই যে দীপিত রোদ এইখানে আঁধার ঘনাবে,
এই যে পুরুষ যায় এই হবে প্রমত্ত নায়ক-
তারপর শেষ হবে পৌরুষের সব ছলাকলা,
রক্তমাখা উত্তরীয় কালপ্রাতে মাছেরা জড়াবে।'

এই বলে তিন নারী ছুড়ে দেয় সুতলির টাক,
নিবদ্ধ শিকার শুধু জলে দেখে ঘূর্ণ্যমান পাক।

কবিতাটির দ্বিতীয়ভাগে কবি আবারও তিন রমণীর মুখোমুখী হন। এখানে এক সময় তারা কবির চোখ তুলে নেন আর আহ্বান করেন তাদের কলসের ভেতরে জায়গা করে নিতে। এই পুরো ব্যাপারটিতে সৃষ্টি আর সৃষ্টি-চৈতন্যের মেটাফরের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে ম্যাজিক 'কলস' অবশ্যই একটি প্রতীকি বার্তা নিয়ে আসে। নারীর জন্মদানির মতো এই কলস কবির নতুন কবিতার বীজাধার যেন। এখানে সকল বন্ধ্যাত্ব আর অন্ধত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। এই কলস এক আই-ট্রান্সপ্ল্যান্ট হাসপাতাল- যেখানে হারানো আলোক খুঁজে পাওয়া যায় অবশেষে। আবার এ যেন কবি আর মানুষের যৌথ পারগেটরি অবস্থা- নিজের পাপস্খলন আর পাপমুক্তির যাত্রাবিন্দু। এখানে প্রশ্ন জাগে- কবির চোখ কেন তুলে নেয়া হল? বহুদিনের ব্যবহৃত জীর্ণ, বন্ধ্যা দৃষ্টিকে বাতিল করে আজ তার নতুন চোখ পাওয়া প্রয়োজন। তিনি যেন পেয়ে গেলেন তার সময় তার আশির দশকের ট্রেন্ডকে দেখার ম্যাজিক মিরর- সেখান থেকেই তার ভবিষ্যত কবিতা জ্বলে উঠল ধীরে ধীরে। এখানে 'মগ্নতা' আর 'পূর্ণতা' শব্দ দুটি খোন্দকারের সারা জীবনের আরাধ্য, তার কবিতার প্রধান দুটি বাঁক, প্রধান দুটি স্বরকেই যেন ধরে রাখল। তার ধ্যান তার ভিশন তার সমর্পণের পর পাওয়া 'সেকেন্ড আই' যেন তার আত্মোপলব্ধির মর্ম কথাকেই জানান দিচ্ছে।

একজন হাত তুলে বলল, 'দাঁড়াও কথা আছে'।
একজন কলস নামিয়ে বুকে আড়াআড়ি রাখলো দু'হাত,
অন্যজন তিরস্কারে বিদ্ধ করে চোখ দুটো খুলে নিল।

আমি চিৎকার করে বললাম, 'তোরা কারা'?

আমি বলি, 'আমার তো চোখ নেই, অন্ধকার মুখ
কী করে দেখাবো বলো, ওরা যদি আমাকে না নেয়?'

বলে তারা, 'তুই আয়, কলসীর মগ্নতায় তোকে ভরে নিই,
পূর্ণতা প্রকাশ হলে তুই-ই হবি একমাত্র আলোর গোলক।'

তিন নম্বরের কবিতাটির মধ্যে দেখা যায় তিন রমনী- জননী, প্রেয়সী ও বোন। আসলে তারা একজন রমণীই। হিংসা, মায়া আর প্রেমের ট্রিনিটি। এখানেই খোন্দকারের তিন রমণী ম্যাকবেথের তিন ডাইনিদের থেকে আলাদা হয়ে যান। নাটক থেকে কবিতা আলাদা হয়ে যায়। এখানে কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নয়, নয় কোনো নির্দেশ, এখানে কবি মিশে যান তার ধ্যানগ্রস্ত মুহূর্তটিতে, কবি জীবনের সেই আর্কিটাইপাল সৃষ্টিভূমিতে- যেখানে কবির মুক্তি আসন্ন হয়ে পড়ে, কবি তার সৃষ্টিতে এক হয়ে যান।

এক নারী কাছে এসে তুলে নিল চিবুক দু'হাতে,
চুমু খেল চুলের সীমান্ত এসে কাঁটাতার তুলে রাখে
যেইখানে, বলল, আমি তোর একক জননী
আমাকে চুম্বন কর-
আমার উত্থান ছাড়া নীল নিসর্গের জল অর্থহীন, বৃথা।

মধ্যাহ্ন দুপুরে এক ভিন্নতর নারী এসে দিল হাতছানি,
বলল, এসো, আমার চুলের মধ্যে মুখ রাখো, হাত রাখো
হাতের ভেতর,
জগৎ ও জন্মের খেলা তোমাকে দেখাবো চলো-
কোথায় শম্বর কাঁদে নষ্টনীল চাঁদের জ্যোৎস্নার নিচে
অথবা কোথায়
জলের ঘূর্ণির মধ্যে ভেসে ওঠে ক্রমাগত চৌষট্টি গোলাপ।
আমি তার বিনম্র হাতের নিচে ক্রমে গলে যেতে থাকলাম,
সামনে বাড়ব কুণ্ড
আর আমি নিজেই তখন এক প্রজ্বলন্ত গীজারের চোখ।

মগ্নতার যে আবিলতা যে একাগ্রতা তার থেকে কোনো কবি তার সৃষ্টিকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেন না। কারণ কবিতা শেষ পর্যন্ত কবির সেই গভীর আত্ম-সম্মোহনেরই সাক্ষী। তার সারা জীবনের কাব্য ভাষাতে এই বিশেষ সম্পদটুকুই শুধু থাকে। বাকীটুকু শুধু বাষ্প, ধোঁয়ার কুণ্ডলি। 'তিন রমণীর ক্বাসিদা' কবিতায়, খোন্দকারের এই মগ্নতা আর পূর্ণতাই প্রমাণ করে যে আশরাফ আসলে কোনো রাজনৈতিক ধারার বা উচ্চ কণ্ঠের কবি নন। তিনি তার সামগ্রিক কাব্যে- সমাজ সচেতনতা বা সংগ্রামী চিন্তা চেতনার দ্বারা যতটুকু আন্দোলিত হয়েছেন ততটুকু শুধু তার সুপারফিসিয়াল মোহগ্রস্ততা যা কিনা সমাজের সৃষ্টি, কবির নয়। কবি

আত্মবিশ্বাসি আর দ্রষ্টা হয়ে যে সব উচ্চারণমালা আমাদের কাছে কুমিউনিকেট করেছেন তার ভেতরই আমরা সত্যিকারের একজন কবির কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করি।

২০/০৮/২০১৩

পাঠকের কবিতাবিচার

পৃথিবীতে কবিতা লেখার জন্য কোনো ডিগ্রি লাগে না, সার্টিফিকেট লাগে না। যদি এমন একটি ব্যবস্থা থাকতো তাহলে যে কি হত ভাবতেই মন শিউরে ওঠে। আজকাল কোথাও কোথাও কবিতা লেখার জন্য ট্রেনিং দেয়া হয়। কিন্তু এটি যে কবিদের কোনো কর্মসংস্থান তৈরি করার জন্য নয় তা নিশ্চিত। শুধু কবিতা লেখার কিছু নিয়ম কানুন বা অবসরে আড্ডা দেওয়ার অথবা কিছুদিন বেকারত্ব গোছাবার জন্য যে এটি হয় বোঝা যায়। তার সূত্র ধরে কাব্য-অলঙ্কার শাস্ত্র এরকম বিবিধ ভাষাগত প্রক্রিয়াপ্রণালী শিখে হয়ত মস্ত পণ্ডিত সাজা যায়। পণ্ডিতের হাতের কবিতা যে কি রচনা তা পাঠক মাত্রই জানেন। চোখ বড় বড় করে, কৌতুকের সাথে দেখতে পাওয়া যায় কবিপণ্ডিতের অলঙ্কার শাস্ত্রেও ধন্ধুমার আসর, ভেলকি-কারবারি। কিন্তু একবার দুবার পড়েই চুপশে যায় মন। কারণ সেখানে থাকে শুধু টেকনিক, ভাব আর বিষয়বস্তুও অসহায় পুনরাবৃত্তি বা রিমিক্সিং। থাকে না নতুন চিন্তা-চেতনার সমবায়ে গড়ে ওঠা- বাকগর্ভে জন্ম নেওয়া প্রতি-প্রথিবীর ধারণা, থাকে না কোনো রহস্য, গভীর বোধের আড়াল, পাওয়া যায় না তার ভেতরে ঝুলে থাকা অসীমের খেলা। কবির রচনাকে যে জিনিসিটি কবিতা করে তা এই প্রশিক্ষণ কলাকৌশল বা শিক্ষার একদম বাইরে। সে জিনিসটি যে আসলে কি তা আজো রহস্যময়, আমাদের বোঝার অতীত। আদিযুগের কবি থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং হাল আমলের এক তরুণতম কবিও এর উত্তর খটুজে খটুজে হয়রান। অব্যাখ্যাত, অধরা, অজানা এমন এক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার পথ ধরে ধরে সে আসে যে কেবল এটি অনুভবের মাধ্যমেই বোঝা যায়। আদিতে রাজকবি সভাকবি ইত্যাদি ছিল। এখনো পৃথিবীর সভ্য দেশে কাউকে কাউকে পোয়েট ল্যরিয়েট হিসাবে নিযুক্তি দেওয়া হয়। মস্ত বড় মাসহারা দিয়ে সরকার এই সব রাজকবি, সভাকবিকে পোষে। তখন এই কবি রাজ্যের নিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারিদের মতো একজন ভৃত্ত মাত্র। তার কাজ হয় রাজ্যসেবা, অবশ্য ভাষা দিয়ে। কিন্তু এটি কোনো সার্টিফিকেটের বদৌলতে যে পাওয়া নয় - কবির পরিচিতিটি দেখলেই বোঝা যায়। এটি একটি শোভা বর্ধনকারী সামাজিক সাংকৃতিক বা আন্তর্জাতিক মূল্য পাওয়ার জন্য সরকারের ভাওতাবাজি মাত্র। কবি হওয়ার জন্য কোনো সার্টিফিকেট বা যোগ্যতা লাগে না আর একটি কারণে- সমাজ রাষ্ট্রে এর কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নাই। সমাজ রাষ্ট্র শুধু তাকেই লালন পোষণ করে যাকে দিয়ে তার কাজ হবে যেমন ক্লিনার, ড্রাইবার, হেয়ার ড্রেসার, গার্ডেনার বা ইলেক্ট্রিশিয়ান ইত্যাদি। বাংলাদেশ

একটি অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া দেশ বলে অবশ্য এইসব প্রফেশনে কোনো গ্ল্যামার নাই, দাম নাই, মাসহারা নাই যেমন আছে বেহুদা কাজের দালাল রাজনীতিক, মন্ত্রী, আমলা, বুদ্ধিজীবীর ব্যবহারিক মূল্য। কবিতা দিয়ে কোনো কাজ হয় না- না সঙ্গম না সংগ্রাম, না শান্তি, মেয়ের বিবাহ দান, পুত্র কন্যার চাকরি বা নিদেন পক্ষে একদিন ভরপেট খাওয়ার গ্যারান্টিও কবিতা দিতে পারে না। তা দিয়ে বড়জোর একটি অপরিণত কিশোর প্রেম হতে পারে। কিন্তু সেই কিশোরী বেশি দিন টেকেনা যখন সে টের পায়- প্রায় বেকার স্বাপ্নিক কর্মবিমূখ অকেজো প্রেমিকবরটি তার আসলে কোনো কাজেই লাগে না। তাই সামাজিকভাবে এটি কোনো দরকারি কাজ নয়, পেশা নয়, পেশন ছাড়া। তবু বিস্ময়কর ব্যাপার যে হাজার হাজার বছর ধরে কেমন করে এই শিল্প মাধ্যমটি টিকে আছে প্রথমে ব্যক্তিক ও পরে কিছুটা হলেও সামাজিকভাবে! সময় সুবিধা মুখ মান চুরি করে আমাদের মতো কেউ কেউ আজো কবিতা লেখে, আজো পৃথিবীর নানাবিধ মায়াবী সুন্দর অসুন্দরের খেলা দেখে আশ্চর্য হয়, টের পায় শিরায় শিরায় ধাক্কা, আবেগ ভাব কল্পনায় তাড়িত হয়ে এমন একটি ভাষায় লেখেন তার অনুভূতি অভিজ্ঞতাকে যে সেটিকে পড়লেই মন আমাদের অন্যতর আলোকে উড়াল দেয়। পাশাপাশি আবার অনেককে দেখেছি লেখা শুরু করে ছন্দ শেখে, অলঙ্কার পড়ে, কবিদের সাথে আলাপ আলোচনায় বসে। তার মাথা একদিন আকাশে লাগে। কিন্তু এদের অনেকেই কোনোদিন কবি হতে পারে না। কারণ সে শেখে, না জাড়িত হয়, না আন্দোলিত হয়, না দলিথ মথিত হয় নতুন চিন্তন চেতনায়। শুধু আটকে থাকে একটি বদ্ধ জলাশয়ে।

এবার আসি সোনার পাঠকের সন্ধানে বা তাদের চরিত্র নির্ধারণে। কে সেই পাঠক- কবিতার পাঠক? কোথায় থাকে সে? কী তার পরিচয়? কেমন করে সে জনপ্রিয় অন্যান্য মাধ্যম- বইবিচিত্রা গল্প কাহিনী ছড়া রম্যরচনা রান্নাবান্না রূপচর্চার রেসিপি ছেড়ে- একটি কবিতার বই কেনে। আর বাড়ি এসে আর্শ্চর্য হয় - কবিতা পড়ে আর ভাবে আহা কি সুন্দর!। এই যে সে বললো সুন্দর। এ জিনিসটি সে কোথা থেকে পায়? তখন আমরা বলতে পারি কী কী যোগ্যতা নিয়ে সে কবিতার পাঠক হয়ে যায়? মনে করে নেই যে কবিতার ভাষা আর কথাসাহিত্যের ভাষা এক নয়। যেখানে কথা সাহিত্য জনরুচির কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেয় সেখানে কবিতায় আছে আড়াল, আশা কল্পনার স্তরীভূত ঘরবাড়ি, ভাবের সাথে শব্দ ও বাক্যের চূড়ান্ত মিলনহীন খেলা, তার অসীম অনেক সময় অর্থহীন প্রকাশ ও ব্যঞ্জনা। সে বুঝতে দেয় না সে মানে দেয় না, সে অনুভব করতে বলে শুধু। তাই যে পাঠক- সে এসব টেকনিকের তথ্যাদি আগে থেকেই

প্রোগ্রামড করে রাখে তার মনের কম্পিউটারে। যদি তাকে কগনিটিভ অর্জনও বলে বুঝি- সে এটি পায় কোথা থেকে? আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যে কবিতার পাঠক অধিকাংশই কবি-পাঠক বা কবি নিজেই। আর যারা সাধারণ পাঠক, কবিতা লেখে না ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে তারাও হয়ত একদিন চেষ্টা তদ্বির করেছিল লেখার, কবি যশোঃপ্রার্থী সেজে একদিন ঘুরে বেড়াত সাহিত্যের মধুকুঞ্জে। কিন্তু যখন নিজেই বিচারক হলো তার কবিতার, কঠোর বিচারক তখন একদিন সে বুঝতে পারল যে আসলে কবিতা অন্য জিনিস। শুধু অন্তমিল, আভিধানিক শব্দ, কাব্যিক শব্দ, বিশেষণে পাতা ভরে দিলেই কবিতা হয় না। হয় রচনা মাত্র। তাই সে পাঠকই থাকে। আবার যে ভালোবাসা দিয়ে সে প্রথম কবিতা পাঠ করেছিল, লিখেছিল দুই একটি কবিতা সেই ভালোবাসাই তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে কবিতা পাঠে, পাঠক হিসাবে।

আসলে কবিতার পাঠকের কাছ থেকে কবিতা যা দাবী করে সেটি হল পাঠকের মনে চেপে থাকা টোটাল এটিটিচিউড, যার স্পর্শে পাঠকের রূপান্তর ঘটে একধরণের। সে চায় পাঠক আর 'মিঃ সামবডি' না থাকুক। তাকে ভেঙ্গে আনে কবিতা। তার আসল পরিচয় বাদ দিয়ে বা তাকে আক্রমণ করে তাকে নাঙ্গা করে আর একটি পরিচ্ছদে তাকে বসিয়ে দেয়। তখন তার নাম হয় মিঃ পাঠক, কবিতার পাঠক। কবিতা চায় কবিতার রূপ, রস, ধ্বনির সাথে সাথে এই পাঠক পারসোনালিটির বিপর্যয় সংঘাত আঘাত আক্রমণ এবং সব শেষে বিরতি, বিবৃতি বা নিমজ্জন। কবিতা চায় পাঠক এর অদেখা অব্যখ্যাত ব্যঞ্জনা, ভাষা ইশারা কল্পনার রঙ, সব কিছুই ধরে ধরে দেখুক, অনুভব করুক। কবিতা লেখার জন্য ডিগ্রি লাগে না কিন্তু পাঠক হওয়ার জন্য হয়ত অলিখিত যোগ্যতা লাগে, আয়োজন লাগে। কেননা কবিতা লেখার পর পরই এটি কবির আর কিছু থাকে না। তখন পাঠক হয়ে যায় এর নতুন কবি বা রূপকার। সে হয় আবিস্কারক, পালক বা বিনাশকারি। সে যখন এখানে নিবদ্ধ হয়, হারায় তার অহং তখন সেই অজান্তে সৃষ্টি করে আর একটি কবিতা, যা তার দ্বিতীয় পর্ব, দ্বিতীয় জন্ম। পাঠকের ডিগ্রি বলতে সাদা কাগজে কোনো সত্যয়নপত্রর কথা বলি না। এই ডিগ্রিটা তার মন মেজাজ সংস্কৃতি পঠন শিক্ষা রুচি ইত্যাদির যোগফলে সৃষ্ট একটি মানসিক টোটাল এটিটিচিউড। এটি সে হঠৎ করে পায় না। জন্মগ্রহণের সময় যে ব্যক্তিক ও সামাজিক জীন নিয়ে সে জন্মগ্রহণ করে সেখান থেকে শুরু হয় তার যাত্রাটি। তার পরিবার, সমাজ তার শিক্ষা এবং সর্বপোরি তার সেই পাঠজগত সেখানে গিয়ে এটি একটি ভিত্তি তৈরী করে। তার মূল্যসংযোজন মূল্যনির্ধারণের সূত্রগুলো আহরিত হয় এখানে। তার এই মানসপর্বটি পুরোপুরি একক কোনো সত্তা নয় যে

এটি উন্নত বা মন্দ রুচি গড়ে দেবে। ব্যক্তির মানস আর তার বাইরের সমাজমানস পারস্পারিক নির্মাণ করে পাঠরুচি। তাই বলা যায় একটি দেশের পাঠকের মানসভূমিটির পরিচয় লাভ করতে পারলে সেই দেশে শিল্পকলার প্রতিটি মাধ্যম আর্ট সঙ্গীত সাহিত্য কবিতার অবস্থানটুকুর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতার বিচার- ভালো লাগা মন্দ লাগা- পাঠকের এই অন্তর্নিহিত রুচি আর শিক্ষার দিকে তাকিয়ে থাকে। কবিতা যেহেতু একটি ইউনিভার্সেল শিল্পমাধ্যম, তাই এর গড়ন, চাল, চলন শেষ পর্যন্ত একটি বিশেষ দেশের হয়েও আন্তর্জাতিক। মানে এর ভেতরে লুকিয়ে থাকা রূপ, রঙ, প্রাণ পৃথিবীর সব মানুষের ফেলে আসা সময় বা আসতে থাকা সময়ের ইশারা । কবিতাকে যে সবিশেষ নির্মাণ, বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে যেতে হয় তার আভরণ সে উদ্ধার করে এই স্বদেশে আসনগড়া নিজস্ব ও বিশ্ব জ্ঞানবিজ্ঞান আর শেষে ভাষার ভেতরে বহমান মানুষের লুক্কায়িত ছায়াকায়াকে। সাথে সাথে আজ আজকের এই ই-প্রযুক্তি আর্ন্তজালিক পঠন পাঠনের সর্বগ্রাসী বিরামহীন উপস্থিতির সময়ে বলতে হয় যে পাঠকের মন মেজাজে আসছে বিরাট এক পরিবর্তন। পাঠক আজ হাতের মুঠোয় পাচ্ছে আকাশ, মাটিতে যা আছে প্রায় সবকিছুরই ধারণা। কিন্তু এই ধারণাজ্ঞানকে সে যখন কবিতাপাঠের একটি প্রায় অধরা লুকানো পরিবেশের উপর প্রয়োগ করে তখন তাকে একটি আমূল পরিক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। তার মূল্য বিচার শধু কবিতাটির পাঠনির্ভরই হয় না, তা ঘটে তার এই যে একটু আগে বল্লাম টোটাল মানুষটির নিমজ্জন প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে। আবার এই পাঠক কোনো কোনো সময় কবিদের চেয়েও আগুয়ান যখন দেখি কবি তার পুরানো কথাকাহিনী, বিবিধ অলঙ্কারশাস্ত্র ক্লিশে স্টাইল নিয়ে আর সামনে যেতে পারছে না। তাই পাঠকের কবিতার মূল্যবিচার একটি অদৃশ্য সুতোর মতো ধরে রাখা তার টোটাল মানসতার সাথে কবিতার মূল্য সংযোজনের বা বর্জনের মাধ্যমে ঘটে।

একটি অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে চর্চা করা একটি পরিচিত কাব্যিক স্টাইল- এর গঠন চাল চলন একটি সামাজিক পাঠকগোষ্ঠী সৃষ্টি করে- যারা একই সময়ে পাঠক ও কমবেশি কবি-চরিত্রের। তাদের এই পরিচিত একই সুরের ও কারুকার্যের একচেটিয়া কলাকৌশল এমন যে তারা নিজেদেরকে ধীরে ধীরে এক একটি ট্যাবু আর টেম্পোতে নিজেদেরকে বেঁধে দেয়। তাদেরকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে নতুন পাঠক ও কবিকুল পাঠ করে, অবলম্বন করে বা দীক্ষিত হয়। আশ্চর্যজনকভাবে এরা এমন মাথাভারি বদ্ধমনের মানুষ যে পৃথিবীর সব জায়গাতে স্বভাবশুদ্ধ পরিবর্তন আসলেও তারা চোখে দেখে না বা পাত্তা দেয় না। সে শুধু তার খোলটা দেখে তার রূপটা অন্যের মাঝে খুঁজে বেড়ায়। যে কবি প্রতিষ্ঠিত যে কবি

এতদিনে তার মনমোহনী ভূবনজাল সুষ্টি করেছে, সৃষ্টি করেছে তার অন্ধ অনুসারীদল, যে কবি চালাক চতুর কপিবাজ, কুটিল রাজনীতিক, সে পাঠককে একটি সময় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এটি ঘটে কবি পাঠক সমান্তরাল ভঙ্গিতে। যখনই কোনো নতুন বাঁক নতুন কবিতার পথ পাওয়ার সম্ভাবনা আসে তখনই এই চালাক কবি বা কবিসংঘ এটিকে এড়িয়ে চলে বা পারলে নিন্দা করে। আজকের বাংলাদেশের কবিতার দিকে তাকালেই এই বিষয়টি পরিস্কার হবে। পাঠকের রুচি সেই কবি কবিগোষ্ঠীর চাপ প্রতাপ রাজনীতি ও মিথ্যাচারে নিয়ন্ত্রিত, রূপান্তুরিত, কুলষিত, পর্যদুস্ত যেমন বাংলাদেশের রাজনীতি। এমন অবস্থায় যে সঠিক কবিতার বা নতুন কবিতার সঠিক মূল্য বিচার হয় না এটি বলা যায়। আর সেই পাঠক নিজে যদি কবি হয়ে থাকনে তাহালে বিপদ আরো বেশি। কারণ সে অসূয়া হিংসাপীড়িত তার বিচার তখন অন্ধতায় দুষ্ট তার আলোচনা তখন প্রতিহিংসার বাতাসে বাড়ন্ত। এখানে সুস্থপাঠ বা আলোচনা হয় না কখনো। এ এক বন্দি দশা কবিতার, শত ডানা চোখ পথ ধরেও সে অন্ধ পক্ষপাতদুষ্ট পাঠকের মেজাজ মর্জি এবং সবশেষে অসত্য মিথ্যা স্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল। এই যে পাঠক সে তখন আর তার নিজের বোধ শিক্ষা দিয়ে কবিতার বিচার করে না বলে সে নতুন আলোর পথটিও দেখতে পায় না। সে মিনার গড়ে মিথ্যার, বাজে কবিতার মিনার। যেমন চারিদিকে দেখছি আজ।

যেহেতু কবিতার অধিকাংশ পাঠকই কবি বা পাঠক-কবি তার রুচি তার মূল্যবিচার পরিবর্তন, নতুন জ্ঞান-দর্শনে বিন্যাসকরণের সময় হয়েছে। সময় এসেছে তার আবিষ্কার আলোচনা বা মূল্য নির্ধারণের খোল নলচে পাল্টে ফেলার। পাঠক কীভাবে কবিতার মূল্যবিচার করবে?। বলা যায় যে যারা সৎ সমালোচনা করে তাদের মন্তব্য টিকা টিপ্পনি পড়ে নিজস্ব বোধকে একটি সৎ স্বাধীন সত্য সরলতায় জাড়িত করে। সৎ বিষয়টি যেহেতু ব্যক্তির নৈতিকতার সাথে জড়িত তাই তাতে কারো হাত থাকে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার মাথাটি নিজে পরিস্কার করে বা লোকলজ্জার আক্রোশে মাথা কাটা যাওয়ার মিথ্যা মধ্যবিত্তসুলভ অহংশক্তিকে না মুক্তি দেয়। আর যে চালাক চতুর কবির কথা বললাম সে বাঙালির সেই মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতা এমনভাবে ধরে রেখেছে যে তার বহুদিনের চরিত্রটির রূপ আর পাল্টাতে চায় না। সে একটি হীনমন্নতায় ভোগে-সে ভাবে পাছে তার সাহিত্যিক কুটনীতি ধরা পড়ে যায় আর পদটা খোয়া যায়। সে আশ্চর্যজনকভাবে বোঝে না যে সত্যিকার কবিতার মূল্যবিচারের পর যা পাওয়া যায় সে'টি কোনোদিন তার ও তার অনুসারীদের মিথ্যাখেলা, চালাকির ঘূর্ণিতে আটকে থাকবে না। আজ না হোক কাল সেটি আলোতে আসবে,

পাঠককে পাবে সঠিক জাতবিচারের চাবিকাঠি। আম জনতা-পাঠক রুচি বিচারবোধ পরির্তনে এই অন্ধ কবি-পাঠকেরও প্রয়োজন আছে। অনেক তর“ণ আছেন যারা এইসব মিথোজীবি কবিদের শেখানো রস গিলে গিলে নিজেরাও এক একটি মিথে পরিণত হতে চাচ্ছে। তাদের এই সত্য শেখাবে কে - যে সাহিত্যের রাজনীতি আসলে এক বিষভাণ্ডের মতো। তার থেকে মুক্তি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত ভালো। তারা মনে রাখে না যে পপুলার কবি আর শক্তিমান কবি এক জিনিস নয়। তবে সত্যি যে পপুলার কবি জনরুচি যে ভাবে টানতে পারে শক্তিমান কবিরা হয়ত সহজে তা পারে না। কারণ তাদের নির্মিত কবিতা তাদের উপস্থাপন আমাদের প্রচলিত বোধের গভীরে গভীরে অবস্থান করে, তা আবার কখনো সময়ের বাইরে বা আমাদের চোখে দেখা তাৎক্ষণিক সময় সমাজ সভ্যতার বাইরে। পাঠককে তার বিচারবোধকে পরিচালনা করতে হয় কবিতার এই ভেতরটিকে ধরেই।

২৫/১১/২০১০

একটি কবিতা পাঠ
রবার্ট হাসের হিরোয়িক সিমিলি

কবিতার শিরোনামটির বাংলা অনুবাদ করলে হয়ত এর নাম দেওয়া যায়- 'বীরোচিত উপমা'। আকিরা কুরোসওয়া'র বিখ্যাত সিনেমা 'সেভেন সামুরাই(১৯৫৪)'এর একটি বিশেষ দৃশ্য এই কবিতাটির জন্মের কারণ হয়ে থাকবে। কখনো কখনো সিনেমার কোনো বিশেষ দৃশ্য কবির ভাবনাকে স্পার্ক করতে পারে, তাড়িয়ে নিতে পারে একটি অলৌকিক মুহূর্তের দিকে। এর থেকে যে আর একটি প্যারালাল শিল্প সৃষ্টি হতে পারে বা সিনেমার আলো-ছায়াকে কাজে লাগিয়ে চিন্তাকে আরো ভিন্নমুখি বয়ানের সুবিধা দেওয়া যায়- এই কবিতাটি তার একটি অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে। কবিকে আমি চিনতাম না। ইন্টারনেটে ব্রাউজ করতে করতে এই এক আশ্চর্য কবিতা পেয়ে যাই। । কবির নাম রবার্ট হাস। আমেরিকান কবি। জন্মেছেন ১৯৪১ সালে সান ফ্রানসিস্কোতে। তিনি আমেরিকার পোয়েট লরিয়েট হিসাবে ১৯৯৫-১৯৯৭ কর্মরত ছিলেন। তার বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে 'টাইম এণ্ড মেটেরিয়ালস(পুলিৎজার পুরস্কার প্রাপ্ত),' ও 'সান আণ্ডার উড' অন্যতম।

যারা সেভেন সামুরাই দেখেছেন তারা হয়ত মনে রাখবেন যে, টাকুগাওয়ান ডাইনেস্টির সময়ে একটি কৃষক সম্প্রদায়- তাদের ক্ষেতের ফসল ডাকাতদের কাছ থেকে বাঁচানোর জন্য সাতজন সামুরাইকে ভাড়া করে। আক্রমণের দিনে সেদিন খামারে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। এক সময় একজন ডাকাত একজন সামুরাইকে(অসিযোদ্ধা) অ্যাটাক করলে, সে মাটিতে পড়ে যায়। আর সেখান থেকেই হিরোয়িক সিমিলি কবিতাটার শুরু। আর চতুর্থ বাক্যটার সাথে আসল সেই বীরোচিত উপমা- সামুরাই মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, পাইন গাছের মতো। মৃত সামুরাই একটি পাইন গাছ-এ দেখা থেকে কবিতাটা খুলছে কাহিনির আকারে। পড়ার সময় মনে হলো কি এক যাদুকরী ভাষার স্পর্শে একটার পর একটা দৃশ্য ঘটে যাচ্ছে। সিনেমার ছায়া-বাস্তবতা থেকে আমরা চলে যাচ্ছি- সেই কবির মিরাকল জগতে যেখানে কবির এক্সট্রা কনশাসনেস তার মানবিক কল্পনার সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। ঘঠনার শুরু সবটাই ম্যাজিক রিয়েলিজমের হাত ধরে কিন্তু ঘটনার বিস্তার ঘটল চিন্তা, চরিত্র আর ভাষার অসম্ভব ভারসাম্যে। কী অসম্ভব মুন্সীয়ানায় হাস এই কবিতায় ব্যবহার করল কল্পনার অভিনবত্ব, হাজির করলেন ঐতিহাসিক সামুরাই উপখ্যান, বাইবেলের সাতদিন ও হোমারের

ইলিয়াড। তারপর কাঠুরিয়ার(ফিজিসিয়ান) মাধ্যমে পাইন গাছের কাটাকুটিতে যেন তিনি বলে যাচ্ছেন অসিযোদ্ধার মরণ, শব ব্যবচ্ছেদ, কাঠুরের আগমন, তার মুনাফা মূলধন, পরিশেষে মানুষের ভয়, মানুষের পরাজয় মানবিকতার হ্যালোসিনেটিভ, অসহায় অবস্থা ইত্যাদি। এ যেন বাস্তবে ঘটে যাওয়া এক অবাস্তবতার বিস্ময়কর এক পরা-পৃথিবী। সামুরাইয়ের পতনের বিষয়টা থেকে কী করম অবলীলায় চলে গেলেন একটি ট্রানসেন্ডেটাল অভিজ্ঞতার যাদুময় বিবরণে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো কবি হাস এ ঘটনাগুলিকে বাঁধলেন একই সুতায়। এই যে হঠাৎ একটা স্পার্কের সূত্রে একটা অতি-কল্পনার সৃষ্টি, তারপর ঘটনার আড়ালে জমে থাকা আর এক দ্বিতীয় ঘটনার পরম্পরা ও তার সাথে বিষয় আর বলার নিঁখুত রসায়ন- এই বিশেষ গুণাবলিই হাসকে একজন শক্তিশালি কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে।

হাসের সময়ে বিশেষ করে ষাট সত্তর দশকের দিকে আমেরিকান কবিতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। মিলিট্যান্ট কবিতা(বিদ্রোহী কবিতা), অ্যাপোলোজেটিক কবিতা(ক্ষমা প্রার্থনামূলক কবিতা) আর এমপ্যাথেটিক কবিতা(সমব্যথী কবিতা)। হাসের এই কবিতার বলা আর স্টাইল দেখে বলা যায় কবিতায় হাস ব্যবহার করেছেন'পোয়েটিক এমপ্যাথি' কৌশল-- মানে কোনো ঘটনা বা চরিত্রের করুণ মূহুর্তের সাথে একাত্মবোধ করা। এই যে এখানে সিনেমার পর্দায়, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকটি ডাকাতের তরবারিতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, যেন একটা পাইন গাছ- বিষয়টি আসলে প্রতীকায়ন করছে একটি প্রতিশ্রতিশীল জীবনের অপচয়। বিষয়টি কত সহজ কিন্তু কি করুণ! এমন সব মর্মান্তিক ঘঠনাগুলো ঘটছে কোথাও, তার সাথে নিজেকে ফিল করা, সমবেদনা জানানো। কিন্তু তাই বলে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা যাবে না। কল্পনার ডানায় ভর করে অনেক দূরে যাওয়া যায়, কিন্তু আমাদেরকে আবার ফিরে আসতে হয়। কারণ আমাদের আরো কাজ আছে, দায়িত্ব আছে শেষ করার:

‘A man and a woman walk from the movies
to the house in the silence of separate fidelities.
There are limits to imagination.’

এবার কবিতাটি পাঠ করা যায়:

Heroic Simile

Robert Hass

When the swordsman fell in Kurosawa's Seven Samurai
in the grey rain,
in Cinemascope and the Tokugawa dynasty,
he fell straight as a pine, he fell
as Ajax fell in Homer
in chanted dactyls and the tree was so huge
the woodsman returned for two days
to that lucky place before he was done with the sawing
and on the third day he brought his uncle.

They stacked logs in the resinous air,
hacking the small limbs off,
tying those bundles separately.
The slabs near the root
were quartered and still they were awkwardly large;
the logs from midtree they halved:
ten bundles and four great piles of fragrant wood,
moons and quarter moons and half moons
ridged by the saw's tooth.

The woodsman and the old man his uncle
are standing in midforest
on a floor of pine silt and spring mud.
They have stopped working
because they are tired and because
I have imagined no pack animal
or primitive wagon. They are too canny
to call in neighbors and come home
with a few logs after three days' work.

They are waiting for me to do something
or for the overseer of the Great Lord
to come and arrest them.

How patient they are!
The old man smokes a pipe and spits.
The young man is thinking he would be rich
if he were already rich and had a mule.
Ten days of hauling
and on the seventh day they'll probably
be caught, go home empty-handed
or worse. I don't know
whether they're Japanese or Mycenaean
and there's nothing I can do.
The path from here to that village
is not translated. A hero, dying,
gives off stillness to the air.
A man and a woman walk from the movies
to the house in the silence of separate fidelities.
There are limits to imagination.

১৫/০৭/২০১৩

২০০৯ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি লিটলম্যাগের জন্য তৈরী করা কবিতা বিষয়ক কয়েকটি প্রশ্নোত্তরঃ

কবিতার পাঠ ও অন্যান্য সৃজনশীল লেখা পাঠের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা কী?

কবিতা ভাষা দিয়ে লিখিত হয়েও শেষ পর্যন্ত একটি ভাষা-উত্তীর্ণ রচনা। আর এর ভেতরে আছে অনেক শূন্যস্থান। সেই শুন্যস্থানে খেলা করা আলোঅন্ধকার রূপ,রস,গন্ধ ও সুদূরের ইশারা প্রাণসঙ্গীত নিয়ে একটি রচনা অবশেষে একটি কবিতা হয়ে ওঠে। তাই এটি পড়ার সময় পাঠকের আর একটি দ্বিতীয় সুপার মানসিক-চোখ খোলা রাখা জরুরি মনে করি। অন্যান্য সৃজনশীল সাহিত্য যেমন গদ্য, গল্প বা উপন্যাস এর উল্টো অর্থাৎ খুবই ফ্লাট, বর্ণনাধর্মী, যৌক্তিকভাবে প্রমাণিত তথ্যাদি নিয়ে নির্মিত, বিচারবিবেচনা নির্ভর, আবার সবটাই প্রকাশিত। পাঠক সরাসরি এর সাথে সম্পর্ক তৈরি করে, যেহেতু এর ভ্রমণ শুধু সারফেসভিত্তিক তাই পাঠককে খুব একটা ভাবতে হয় না। আগে মানুষ কবিতা পাঠ করতো না, কান দিয়ে শুনতো। তখন তো কবিতাকে মানুষ মুখে মুখে ধরে রাখতো, সংঘবদ্ধভাবে। লিখনপদ্ধতি ও পরে মুদ্রণ প্রকৌশল আবিষ্কারের এর পাঠক্রিয়া বদলে যায়। কবিতা হয়ে যায় দলবদ্ধ মানুষের 'বিজয়গীত' থেকে একা থাকা মানুষের ব্যক্তিগত, গোপন জীবনের পঠনপ্রণালী- যাকে ক্রমশ আবিষ্কার করতে হয় না-বলা না-দেখা শূন্যস্থানগুলো। শেষের এই গোপন নীরব পঠনের পক্ষেই আমার অবস্থান। কেননা একটি সত্যিকারের কবিতা এর স্বভাবগুণের কারণেই প্রথমেই পাঠকের মনোলোককে আক্রমণ করে, পরে পাঠক তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক অবস্থান,অভিজ্ঞতা, রুচি মননের সাথে কবির জগতটি মিলিয়ে পাঠ করেন।

কীভাবে (কী কৌশলে) কবিতা পাঠ করলে পাঠক খুব সহজে রস আস্বাদন করতে পারে?

এটি আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে কবিতার রস আস্বাদন নির্ভর করে অনেকটা ব্যক্তির মানসিক গঠন বা রুচির ওপর, ব্যক্তির সৌন্দর্যজ্ঞানের ওপর। আমি যেভাবে একটি কবিতা পাঠ করে আনন্দ পাবো আর একজন পাঠক হয়ত নাও পেতে পারে। আবার এর উল্টোও ঘটতে পারে। কেউ হালকা চালের পদ্যমদে দিশেহারা আবার কেউ সিম্বলিস্ট বা কিউবিক বা সম্প্রসারিত চেতনার কোনো

বিষয়হীন, সুদূরপিয়াসি নতুন কবিতার সমজদার। তাই বলা যায় কবিতার রস আস্বাদন-এর বিষয়টি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। আবার একটি কবিতাই আসলে বলে দেয় এর রসটা কিভাবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ একটি ভালো কবিতা নিজেই এর স্বভাবচরিত্রের কারণে এমন কিছু চরিত্রচিহ্ন ধরে রাখে যে পাঠক আপনিতেই বিভোর হয়। এক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের বহুল পঠিত 'ঘোড়া' কবিতাটির কথা বলা যায়। প্রথমে এ কবিতাটি কবির কাছে সব পাওনা মিটিয়ে লিখিত হয়ে পাঠকের কাছে একটি সম্পন্ন সৃষ্টি হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। পরে যখন পাঠক এটি পাঠ করেন তখন আর একটি পাঠক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এটির পুনর্জন্ম ও বহু স্তরায়ন, নব্য আবিষ্কারের ঘটনা ঘটে।

আজকের কবিতা যেহেতু চলমান সদা পরিবর্তিত বিশ্ব তথা বস্তু,প্রাণী(মানুষ পশু পাখি উদ্ভিদ জগৎ)ও সভ্যতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তাই এটি পাঠকের কাছ থেকেও তার জ্ঞান কাঠামো, রুচিবোধ অর্ন্তদৃষ্টি-ক্ষমতা পরিবর্তনের দাবী করে। কারণ আজকের কবিতা আর ৫০ বছর আগের কবিতা তো আর এক হবার নয়।

আপনি কীভাবে কবিতা পাঠ করেন?

একটি কবিতার পাঠের সময় 'কবিতা' তিন অক্ষরের এই অতিপরিচিত শব্দটাই একটি বিশেষ ধরণের পাঠের ইশারা দেয়। এই শব্দটি আমার ব্যক্তিত্ব বা সামাজিক সংস্কৃতির অংশ, পাঠ আর অভ্যাসের অংশ। যদিও সবার পঠনের স্টাইল এক নয় তবুও কতগুলো মৌলিক বিষয়ে খুব একটা তারতম্য ঘটে না। যেমন সামাজিক অভ্যাসই বলে দেয় যে কবিতা একটি বিশেষ প্যাটার্ন নিয়ে হয় আর এর ভেতরে ও বাইরে ধরা রাখা রূপ, রস, গন্ধ,বর্ণ, প্রাণ ও ইশারা বা সংকেত নিয়েই পড়তে হবে। কিন্তু আজকের অধিকাংশ পাঠকই কবিতা পাঠে প্রথমে এর অর্থ বের করার চেষ্টা করে, এর সামাজিক দায়বদ্ধতা খুঁজে। আমি কিন্তু প্রথমেই অর্থ খুঁজে বেড়াই না, কবিতাটি অনুভব করার চেষ্টা করি। অনুভবের মাধ্যমেই কবিতার আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করি। আমার কাছে কখনো একটি শব্দ বা শব্দবন্ধ বা একটি লাইনকেও কবিতা মনে হয়, যদি সেটি কোনো নতুনের ইশারা দেয়। তখন পুরো কবিতাটি আস্তে আস্তে খোলে। কবিতা না দেখা না বোঝা সম্প্রসারিত চেতনার যা আমার চেতনায় বহু বস্তু, প্রাণ, জ্ঞান আলো-অন্ধকারের সুড়ঙ্গে বাহিত আলোখণ্ডের মতো। তাই এক অর্থে অর্থ খুঁজে,

ব্যাকরণ খুঁজে মর্ম উদ্ধার খুবই বিপদজনক একটি অভ্যাস। আমি যখন কোনো কবিতা পড়ি তখন এর ভেতরে ডুবে থাকা প্রাণটির দিকে তাকানোর চেষ্টা করি। বহু ইঙ্গিতময়ী শব্দ বা চিত্রকল্পের আবহটি ধরতে চাই।

কবিতা যদিও প্রথমে শব্দ দিয়ে লিখিত, লিখিত হবার পরে - এর শব্দগুলো কিন্তু আমাদের চেনা জানা শব্দ আর থাকে না। কারণ একটি দৈনন্দিন শব্দগুলো একটি কবিতাতে মরে গিয়ে নতুন জীবন পায়, নতুন সভ্যতা পায়। প্রাণ পায়। আর আমি এই জিনিসটিই ধরতে চাই। মনে মনে নীরবে। বর্তমান বিশ্বে পাঠপ্রক্রিয়ার নতুন নতুন কৌশল আবিস্কৃত হলেও - সবাই হয়ত একটি বিষয়ে একমত হবেন যে একটি কবিতাকে আমাদের প্রাপ্ত অথবা অপ্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞতার মিলিয়ে এর পুরো জগতটিকে আমরা স্পর্শ করে দেখতে চাই। খণ্ড নয়, সমগ্রতা। তাই আমি শব্দ থেকে শব্দরূপব্যঞ্জনায়, কবির চিন্তা চেতনায় বাহিত দূরতম আলোআঁধারির অচেনা অজানাসুড়ঙ্গ পথটি ধরতে চেষ্টা করি।

সমকালীন বিশ্বে কবিতার কি আদৌ কোন প্রয়োজন আছে?

আমি যেহেতু কবিতা লিখি মাঝে মাঝে নিজেকে প্রশ্ন করি কবিতা কী? এর কি আদৌ প্রয়োজন আছে? কী তার কাজ, সমাজের কাছে কী তার ভূমিকা। কবিতা দিয়ে কি রাস্তা বানানো যায়? অপারেশন করানো যায়? জমিতে চাষ বা দোকানদারি করানো যায়? দরকারি এমন কিছুই করে না কবিতা। হয়ত এভাবে প্রয়োজন নাই কবিতার। কারণ কবিতা বস্তু নয়, আবার সেবাকাজে ব্যবহৃত কোনো জ্ঞানকাজও নয়। মানে এভাবে চিন্তা করলে মনে হয় কবিতার কোনো প্রয়োজন নাই। আবার প্রশ্ন জাগে হাজার হাজার বছর ধরে তাহলে এই অকেজো শিল্পটি কেন এবং কীভাবে আজো টিকে আছে। আজো কেন মানুষ পয়সা খরচ করে কবিতার বই কেনে। আজো মানুষের ভেতর প্রাণটান বলে কিছু আছে, আজো সে সদা ইঙ্গিতময়ী শব্দরূপধ্বনির কাছে তার মানুষ হিসাবে যে অভিজ্ঞান সেটির নিহিত আওয়াজ,স্পর্শটুকু পায়। আজো সে তার হারিয়ে যাওয়া বা না পাওয়া স্বপ্নগুলোকে একটি বিশেষ ভাষায় দেখতে চায়- আর জন্যই কবিতা। যেহেতু মানুষের সৌন্দর্যবোধ মানুষের ভাষানিয়েই এর কাজকাম, তাই যতদিন মানুষের এই বিশেষ বোধ ও মাধ্যমটি টিকে থাকবে কবিতাও টিকে থাকবে ততদিন।

কবিতা কী?

এই প্রশ্নের উত্তরে হয়ত একটা বই লেখা যায়। আর এতো বিচিত্র কবিতা আছে এই পৃথিবীতে যে একটি ইউনিফায়েড সংজ্ঞা দেয়া হয়তো আর সম্ভব নয় এখন। কারণ সময়ের সাথে সাথে মানুষের সাথে সম্পর্কিত সব কিছুরই পরিবর্তন ঘটে এবং ঘটছে। বস্তুবিশ্ব থেকে শুরু করে প্রাণীজগৎ জ্ঞানকাঠামো শিল্পকলা ব্যবসাবাণিজ্য চোখের সমানে যা দেখতে পাচ্ছি না দেখতে পাচ্ছি প্রায় সবই বদলাচ্ছে। তাই কবিতাও বদলাবে। কবিতার পরিবেশন উপস্থাপন টেকনিক আকার শব্দ ভাষা অবশ্যই পরিবর্তিত হবে। হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে সাধারণভাবে আমরা জানি যে কবিতা একটি সাহিত্যের এমন একটি বিশেষ এলাকা যেখানে কবির বিশেষ ভাব তার কল্পনা শক্তির উপর ভর করে তার অভিজ্ঞতা বা চিন্তা চেতনার হাত ধরে একটি সাংকেতিক ভাষিক আবহে প্রকাশিত। আমরা একটা লেখাকে কখন কবিতা বলে ভাবি, কখন বলি এটি কবিতা হয়নি। নিশ্চয় আমাদের পঠন-চেতনায় এমন একটি সূত্র ধরা আছে যেটি দিয়ে আমরা বিচার বিবেচনা করতে পারি, কবিতা ও অকবিতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। অনেকে অনেক কথা বলেছে এ বিষয়ে। আমি মনে করি এর মধ্যে এই চিহ্নগুলো থাকতে পারে যেমন - ইঙ্গিতময়তা এর নতুন ভাব শব্দরাশির পাশাপাশি শব্দশূন্যতা ও ভাষাহীনতার মিথোস্ক্রিয়া। এটি হয়ত আপাত সত্য, কারণ আর সব কিছুর মতোই কবিতার বিষয়, ভাষা, নির্মাণপ্রণালী সব সময় বদলায়, যদিও একদিনে বদলায় না।

আমার রবীন্দ্রশূন্যতা, কবিতাপাঠ সংকট

আমার কাছে এক রবীন্দ্রনাথ অনেক রবীন্দ্রনাথের ছায়া আর কায়া। আর সেটি এক সময় একটি অমীমাংসিত ধাঁধার সৃষ্টি করে। কারণ আমি একজনের এত রূপে অভ্যস্ত নই বা অনেক রূপের ভেতর আসল চেহারাটি হারিয়ে ফেলার একটি সত্য তৈরী হয়। ভাবি সমস্ত রবীন্দ্রনাথ সকলের কাছে প্রিয় তার সমগ্রতার কারণেই। সমগ্রতায় রবীন্দ্রনাথকে চেনা যায় বেশি যেখানে তার ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পন্দন ছাড়াও একটি সর্ববিস্তারি প্রতিভার চিহ্ন আন্দাজ করা যায়। কিন্তু আবার সমস্ত রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কখনো এক রবীন্দ্রনাথ কারো কারো কাছে অধিক প্রিয়। প্রিয় কারণ সেখানে আসল ব্যক্তিত্বের রূপদর্শন -শুধু এক কবির সৃষ্ট পৃথিবীর স্পর্শ পাওয়া যায়। তার মানে সমগ্র রবীন্দ্রনাথ কবি রবীন্দ্রনাথের নীরব প্রতিদ্বন্দ্বী- যদি তার একটি নিউক্লিয়াস পরিচয় খুঁজি- কবিতার পাঠক হিসাবে। কে কাকে হারাল? গল্পকার রবীন্দ্রনাথ নাকি ঔপনাস্যিক রবীন্দ্রনাথ, নাকি গীতিকার রবীন্দ্রনাথ, নাকি আর্টিস রবীন্দ্রনাথ, নাকি কবি রবীন্দ্রনাথ? এ বিষয়টি অন্য একটি প্রবন্ধের বিষয় হতে পারে। যাহোক কবিতার পাঠক হিসাবে এই এক অর্থাৎ কবি রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য লাভই আমার মোক্ষ এবং তার খোঁজে আমি বার হই কিন্তু কোনো এক অজানা কারণে কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতাগৃহে ঢোকার চেষ্টা করেও তাঁর দরোজাটি আমি বার বার হারিয়ে ফেলেছি বা কখনো ইচ্ছে করেই দরোজা খোলার প্রয়োজন মনে করিনি। বাংলা সাহিত্যের এত বড় কবির কবিতার সৌন্দর্যস্বাদ থেকে কেন আমি বঞ্চিত এই বিষয়টি আমার ভেতর একটি বেদনাজড়িত সংকট ও শূন্যতা তৈরি করে। কেন অবহেলা করে ফেলে গেছি কেন আপন করে নিতে পারিনি- এখন উত্তরগুলো আমি খুঁজে বেড়াই।

প্রাকৃতিক ঝরনাকলম

এত বড় গীতিকার কবি গল্পকার উপন্যাসিক গদ্যশিল্পি এত যার সৃষ্টিসম্ভার মাঝে মাঝে মনে হয় একজন মানুষের জন্য এই মরজীবনে তা অসম্ভব, একদম অসম্ভব। লেখা আর পড়া দুটোই। এত লেখা যায় কিভাবে? একটি মানুষ এত লেখে কিভাবে? এ যেন এক প্রবলবেগে ধাবিত সমুদ্রস্রোত যা নিজেও জানে না কোথায় গিয়ে সে থামবে। শুধু বালকবিস্ময়ে ভাবি আমাদের সময়ে রবীন্দ্রনাথ জন্ম নিলে তিনি কি এত লিখতে পারতেন? তাকে কি বাসে চড়ে অফিস করতে হতো না? ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো স্কুলে ভর্তি, চাকরি বাকরির জন্য লাইন দিতে হতো না? মাছের বাজারে গিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে হতো না মাছ

ব্যবসায়ীর বিরক্তপূর্ণ মুখ? তাহলে কি লিখতে পারতেন এত? হয়ত লিখতেন যিনি রবীন্দ্রনাথ হবেন অবশ্য। মাঠে ময়দানে অফিসের টেবিলে বাসের সিটে জাহাজের পাটাতনে বা সোরোওয়ার্দি উদ্যানে, রমনা পার্কের কচি ঘাসে বসে বসে হয়ত তিনি লিখতেন। সকালে কবিতা, বিকালে নাটক, রাতে উপন্যাস গান এসব চিত্র আঁকা সবই সবই সমানে চলত। কারণ তার লেখা দেখে মনে হয় - লেখাই তার নিয়তি লেখাই রবীন্দ্রনাথ। এতো সৈনিকসুলভ শৃঙ্খলা কোন লেখক বজায় রাখতে পারেন আর এরকম ভাগ্য কত জনের জীবনে আসে!

আমার সংকট

কিন্তু এত ঐশ্চর্যের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেও এক সময়ে মনে হয়েছে সারাজীবন আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে দূরে সরে থেকেছি। আমার কৈশোর যৌবনের অনেকটা সময় কোনো প্রয়োজন মনে হয়নি রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যেতে। যতটুকু মনে পড়ে ভুলেই গিয়েছি যে এই কবির কবিতা পড়তে হবে। শুধু দূর থেকে কখনো কখনো তার শাদা শশ্রুমণ্ডিত চেহারাখানা মুখের সামনে ভেসে উঠেছে। ২৫শে বৈশাখ বা ২২শে শ্রাবণ এলে সাপ্তাহিক প্রত্রিকা বা বেতার টিভিতে তাকে নিয়ে অনুষ্ঠান পালন- এসবই চোখের সামনে ভেসে ওঠা আবার চকিতে হারিয়ে যাওয়া দৃশ্যের মতো মনে হয়েছে। কিন্তু এই জীবনে এসে মনে হয়েছে এই বাঙালি কবির কবিতার প্রতি আমার একটা অলিখিত অদৃশ্য সৌজন্যহীনতার প্রকাশ ঘটে গেছে। সেই মোতাবেক মনে হয় এটি একটি শূন্যতা- আমার রবীন্দ্রশূন্যতা বা সংকট। আমার রবীন্দ্রবিচ্ছিন্নতার কয়েকটি ব্যক্তিগত কারণ শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছি যা মূলত ব্যক্তিগতই। তার সাথে সাথে আছে আমার পঠনবিশ্ব ভাবনাজাত সাংস্কৃতিক কারণও, সেটিও ব্যক্তিগতই। বুঝতে পারি আমার রবীন্দ্রশূন্যতা আসলে আমার ব্যক্তিগত রুচির দোষ বা সমস্যা, এত কবি রবীন্দ্রনাথের কোনো যায় আসে না। সর্ব প্রথমে বুঝতে পারি আমার ব্যক্তির রুচির সাথে গীতিধারামূলক কবিতার একটি সহজাত বৈরী সম্পর্ক আছে। অনীহা আছে কবির কবিতার সার্বিক আয়োজন-উপস্থাপনে যেভাবে তিনি কবিতা নির্মাণ করেছেন- তার নির্বাচিত সাধারণ অজটিল বিষয় আশয় যেমন- ঘাস, ফুল, নদী, বাঁশি, নারী, জীবনদেবতা এইসব চিরন্তন প্রাকৃতিক বিষয়ের প্রতি। আবার মনে হয়েছে যে কাব্য-টেকনিক রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন সেটি আমার রক্তে জেনিটিক্যালি প্রোগামর্ড হয়নি, তাই জন্ম নিয়েছে এই পঠনব্যর্থতা এবং তার থেকে এই শূন্যতা।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্র কবিতাপাঠে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে- রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক, আগে বা পরে জন্ম নেওয়া ইউরোপিও সাহিত্যের সাথে আমার অবধারিত পরিচয়, পঠন ও পঠন পরবর্তী ভালো লাগা। দেখলাম ইয়েটস, এলিয়ট, পাউণ্ড, কাফকা, কামু, র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, মালার্মে, পল এলুয়ার, আরাগঁ ইত্যাদির আগমন ও তাদের রহস্যময় আলোঅন্ধকারাচ্ছন্ন মূর্তবিমূর্ত এলাকায় হাঁটাহাঁটি। তাদের বিষয়বস্তু তাদের ভাষার নতুন আয়োজন উপস্থাপনার কৌশল আমাকে অপর কবিতার দিকে নিয়ে গেছে। অবাক হয়ে ভেবেছি- কেন রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দিতে অনেকদিন বিচরণ করেও চোখের সামনে শুধু নির্জলা এই বিশাল প্রকৃতিকেই সমস্ত কিছুর প্রেক্ষাপট হিসাবে বেছে নিলেন? কেন তার কবিতাগুলো বার বার এই অতিচেনা ফিজিক্যাল ল্যাণ্ডস্কেপ যা অবশেষে নরম রোমান্টিক পদাবলীতে পর্যবসিত? কেন তিনি অচেনা অধরা এক ঈশ্বর সন্ধানে বা তার উপস্থিতসঙ্গীতে ভরিয়ে তুললেন তার প্রায় সারাজীবনের কাব্যভাণ্ডার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যেভাবে ভেঙ্গে পড়ল পুরাতন মূল্যবোধ বিশ্বাস, মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, যেভাবে ছড়িয়ে পড়ল আধুনিক মানুষের অনিকেত ভ্রমণ, যেভাবে বাইরের সাহিত্য ধরে রাখল সেই চিহ্ন স্মৃতি পদচ্ছাপ- সেখানে আজন্ম স্বাপ্নিক, রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবীয় আবহ ধরে রেখে- এর ধারে কাছেও আসলেন না! তার ভূবনে উঁকি দিল মধ্যযুগ তার মধ্যে লালিত সহজ সরল এক আদর্শ পৃথিবী, যেখানে পাওয়া যায় ধান বাঁশি, নৌকা, গ্রামের বাড়ি, পথঘাট, রাজা রানী রাজ্য। রবীন্দ্রনাথের মন পড়ে থাকে হারিয়ে যাওয়া সেই ঔপনিষদিক অরণ্যে, গুপ্তযুগের উজ্জয়িনী ও পদ্মাতীরের বাংলার নিসর্গে। দেখলাম তিনি এক রকমের অবজ্ঞাই করেছেন বিদেশি কবিতার এই হাড়পোড়ানো আয়োজন- গলিত শব, কৃমি, পড়ো জমিতে পুড়ে যাওয়া মনুস্যহৃদয়। তার পরিবর্তে মুক্তাঙ্গন তথা বাংলার আকাশে বাতাসে প্রাকৃতিক লীলার জগত থেকে গ্রহণ করেছেন তার কবিতার শ্বাস প্রশ্বাস বিষয়বস্তু- সেখানে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার কল্পনার ডানা। আধুনিক সমাজ সভ্যতা উদ্ভূত দিনবদল তথা মানুষষের মনের গহীনে, অবচেতনে জড়ো হওয়া আর এক অমীমাংসিত মনোরোগ, জ্বরা, মৃত্যু, নচিকেতা ও নিরাশানির্ভও মৃত্যু তাড়িত পৃথিবীর কোনো আবহ তৈরী হল না রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে!

ভাষার সংকট

সবাই জানেন যে রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দেখেন প্রাণ থেকে- মাথা দিয়ে নয়। তাই তার কবিতার ভাষা প্রাণের কাছাকাছি, চিন্তা করে সাজিয়ে সাজিয়ে লেখা নয় এগুলো। তাই এতে ফুটে উঠেছে এক প্রাণের রঙিন আবশে আবেগে জড়ানো নান্দনিক বিষ্ময়। সাথে সাথে তিনি সব সময় চেয়েছেন কবিতাকে 'মিনিংফুল' করার জন্য। অর্থাৎ চেয়েছেন তার কবিতা সমাজ, সংসার, ব্যাক্তি, গোষ্ঠী বা অধিষ্ঠানের কাজে ব্যবহার করার জন্য। এর কারণে তার অনেক কবিতাই প্রায় মূর্ত, প্রকাশিত যা একটি সহজ আধার নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে যা সহজে পাঠযোগ্য। তাহলে কি বলব আমার রবীন্দ্রকবিতা পাঠসংকট শুরু হয়েছে তার ব্যবহৃত বিষয় ভাষা আর আঙ্গিকের কারণেই? বা আমার ভেতরে লালিত পশ্চিমী আধুনিক, এক কীটদুষ্ট সময়- যা মায়াময় সরল রবীন্দ্রবিশ্ব থেকে যোজন যোজন দূরে দাঁড়িয়ে থাকা- সেই সময় কি অগোচরে এই সংকট সৃষ্টি করেছে? বা আমার সময়ে রবীন্দ্রভাষা স্বাভাবিক কারণেই কি পুরাতন হয়ে গেছে? কবিতায় আমি যা চাই- যেমন রহস্যধর্মীতা, অজানা, অচেনা আহবান, দ্বান্দিকতা, কবিতার কেন্দ্রহীনতা, শূন্য স্পেস, সিম্বল-ইম্প্রেশনের জোগসাজস, বিষয়ের আড়াল, অন্তমিল আর কৃত্রিম ছন্দগীতলতার মুক্তি- এসব কি নেই রবীন্দ্রনাথের কবিতায়? যা পাই তা হল এক রূপভারাতুর মধুমদ্য ভূবন -যেখানে নেই ব্যক্তিমানুষের আস্তিত্বিক ভাবনাজাত অ্যাবস্ট্রাক্ট দ্বন্দ্ব, অজানা অচেনার বিস্ময়। আমার ব্যক্তিগত আধুনিক রুচি-সংস্কৃতি তাড়িত পাঠ-অভ্যাস যা এই শূন্যতা সৃষ্টি করেছে তার থেকে মুক্তির উপায় কী? আমি আবার ফিরে যাই তাঁর কবিতার কাছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অপার সারল্য(পাঠশেষে আর মোহনীয় সারল্য আর থাকেনা) গীতিধর্মিতা, রোমান্টিক কাব্যআর্তি তার অচেনা প্রাণদেবতায় নিবেদিত অর্ঘ্যমগুলি থেকে সরে আসি। শুধুমাত্র তার ছন্দের যাদুময় দোলা, মেঘ,বৃষ্টি, নদ নদী আশ্রিত সুখপাঠ্য পদাবলী ছেড়ে- আবারো না যাবার পথ খোলা রেখে চলে আসি। সংকট থেকেই যায় বারবার।

জীবনানন্দীয় অসুখ

এটি প্রায়ই নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে- বাঙালি তরুণ কবি যে একবার জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করেছে তার পাঠের জগত তার রুচি সবই একটি

আকাঙ্খিত হঠাৎ পাওয়া ভীষণ সুন্দরের আলোয় শিহরিত হয়ে উঠবেই। বদলে যাবে তার চিন্তনচেতনার রঙ, তার ভাবনা প্রকাশের ভঙ্গি। জীবনানন্দ যিনি ইউরোপিও বিদেশি কবি সাহিত্যকদের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে পুরো বাংলা কবিতার কারেক্টারই পাল্টে দিলেন- সেও আমার এই রবীন্দ্রশূন্যতাকে দৃঢ় করেছে প্রবলভাবে। অবাক হয়ে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের লিরিক্যাল টোন ধারণ করে ইউরোপিও পরাবাস্তবতা, অবচেতনা তথা বিনাশি শূন্যতার এক নতুন কাব্যভাষা আবিষ্কার করে জীবানানন্দ কিভাবে পৃথক হয়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে! রবীন্দ্রনাথের ইর্ষার পাত্র হলেন এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাকেও ছাড়িয়ে গেলেন। আমার বয়সী এমন কোনো বাঙালি কবি সাহিত্যিক নেই যে এই জীবনানন্দীয় মুগ্ধ-বিষণ্নতা আলোআঁধারীর করুণ, কখনো অচেনা অজানা মোহনীয় ফাঁদে পা রাখেনি। শুরুর পথটি প্রয়োজন আবিস্কারের, পরে অন্য পথের সন্ধান যা হয়ে পড়ে আসলে নিজের। এসবই তিনি করলেন গুরুর পথে গিয়েই। তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়ালো- যিনি অন্যভাবে রবীন্দ্র কাব্য-ভাষা পরিত্যাগ করে ক্রমাগত অনুশীলনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন ভাষা, শুরু করলেন অন্য রকম, বললেন ভিন্ন ভাবে তাকেই ভালো লাগল। তাতেই আমার রুচি ধরল রবীন্দ্রোত্তর এই কাব্যভাষায়। আর আমার রবীন্দ্র কবিতাপাঠের কোনো জায়গাই থাকলো না। তাহলে দায়ী কে? কে বেশি শয়তান?

ধর্মকুয়াশা

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নিয়ে অনেক কথা হয়। কেউ কেউ অনেক সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনীতি করে বেড়ায় এই বিষয়টি নিয়ে। সবারই একটা ধর্ম তো আছেই। এমন কি নাস্তিকেরও একটা ধর্ম আছে কারণ সে যে বিশ্বাস করে না এটিতেই সে বিশ্বাসি হয়ে ধর্মপ্রাণ হয়ে আছে। একজন সামাজিক মানুষ হিসাবে কবি সাহত্যিকদেরও একটি পারিবারিক ও লোকাচার আশ্রিত ধর্ম আর ভেতরে নির্মিত নিজস্ব একটি ধর্ম থাকে। দেখার বিষয় হল এটি সৃষ্টিশীলতার পথে কোনোরূপ দেয়াল তৈরি করল কিনা। মার্কিনী কবি এলিয়ট ধর্মে ক্যাথোলিক। তার ওয়েস্ট ল্যাণ্ড, আর ফোর কোয়ার্টেস বা অন্যান্য সৃষ্টি খ্রীস্টীয় বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে। তার এই বিশ্বাস কবিতার কোনো ক্ষতি করে নাই বরং তার সাবজেক্ট আর স্টাইলের সাথে একিভুত হয়ে কবিতাকে তার শিল্প মর্যাদাসহ কবিতার আধারস্থলই করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যে একক প্রাণনাথে বিশ্বাস সেটির

মোটিফ অনুযায়ি একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের সাথে মিল খায়। কিন্তু তাই বলে তিনি কবিতাকে ধর্মবিশ্বাস প্রচারণার ভারে নিমজ্জিত করেন নি। এই নিবিড় নিবদেন তার গান আর কবিতায় দিয়েছে একটি অপার স্নিগ্ধ আবরণ যার কারণে আমরা একটি সাবলাইম স্প্রিচ্যুয়াল অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। আবার কখনো আমার মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের আসল ধর্মের নাম সঙ্গীত- সঙ্গীতই তার ঈশ্বর তার জন্যই তার জন্ম, বিস্তৃতি আর অপেক্ষা। এই সঙ্গীত-ঈশ্বর তার প্রাণে বীণা বাজিয়ে দিয়েছে যেখানে তিনি সকল মানুষের মিলনের সুরটি ধরে রেখেছেন। আর রবীন্দ্রনাথ হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ খ্রীস্টান, আউল বাউল, ফকির পীর সন্যাসি যাই হোন না কেন এটি আমার কোনো সমস্যা নয়। তিনি একজন বাংলা ভাষার বাঙালি কবি - এটিই আমার কাছে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ সেই বাতাস যাকে ঘিরেই হয়ত আমার এই সাহিত্যিক শ্বাসপ্রশ্বাস নিজের অজান্তেই গ্রহণ করছি। সবশেষে বলতে পারি- আমার কবিতাপাঠ সংকট রবীন্দ্রশূন্যতা একদিকে ভরে দিয়েছে তার অবিনাশী গান, তার গদ্যের পাতায় পাতায় ধরা বাংলা ভাষার ভাঙ্গাগড়া নির্মাণ ও চিকিৎসার বিবরণ। এই গীতিকবির কাছ থেকে বাংলা ভাষার মাস্টারের কাছ থেকে আজো শিখছি আজো তার গান শুনে আন্দোলিত হচ্ছি- সেই মুগ্ধতা হয়ত কোনোদিন কাটবে না আমার।

রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত একটি কবিতা

আমার ছিন্নপত্র

শেষ ট্রেন ছাড়ার পর আকাশে উড়ি
এই পথের সবুজ ঘাসের বাঁশি আমাকে নেবে।
ফুল তুলতে জামা হারাই- জামার হৃদপিণ্ডে
হারিয়ে যাওয়া ছোট নদী ঘুমিয়ে থাকে শিলাইদহে
তাকে যমুনা নামে গোগুল-জোয়ারে খুঁজি।

আবার
ছিন্নপত্রের বেড়া ডিঙিয়ে কুয়াশাঅক্ষর
এই কালো দালান সরিয়ে কিছু গাছ বানাবো
গাছের মাংসে ফুলে ওঠা নৌকা
সাথে বাতাসের পাল কাজুবাদাম

বৌঠাকুরানীর গ্রাম এইসব নিয়ে দেখবো
সকালের মাথা নিয়ে শান্ত হয়ে আছে সন্ধ্যা।

আর যারা থাকে ওপারে
প্রজাদের এই আগুনপ্রথম ছিন্ন করে দেবে
পাখি মারার রাইফেল।
নৌকার মোম পায়ে পায়ে চিড়িয়া দেখে দেখে
তুমি কতো ভরে তুলবে এই কবরের শূন্য!
মোম জ্বেলে জ্বেলে অন্ধ দেখি ইতিহাসের জানালায়
নারীর লজ্জায় কাঁটার জ্যাকেট, কার্ফু এইসব।
নদী হত্যার বেদনা নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়াই
তোমার হাত থেকে গর্জিয়ে উঠুক পারাপারের সিংহ।

২৭/০৯/২০১১

বাঙালি (কবির) মন

বাঙালি কবির মন আন্দাজ করা যায়, নির্ধারণ করা যায় না। কারণ বাঙালি কবি আবার মানুষও। মানবজাতির চরিত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ধারণকারী সকল চিহ্ন নিয়া সে আমাদের পাশেই থাকে। এইসব মায়া আর ছলনায় ঢাকা মনের ধূমায়িত চরিত্রসংজ্ঞা নির্ধারণ করা সহজ নয়। আবার সব মনই কোনো না কোনোভাবে আগে আর পিছে থাকা সময়, তার নিজস্ব ভূমণ্ডল ও ভূস্থিত জলবায়ু এবং তার সাথে যুক্ত অর্থনৈতিক মারপ্যাচ দ্বারা প্রভাবিত। তবুও তার মধ্যে শুধু বিশেষ এক জাতিসংস্কৃতির জিন বহন করার কারণে, একই জ্ঞান দর্শনবলয়ে বসবাস করার কারণে শেষ পর্যন্ত তার একটি আপাত নিদির্ষ্ট বিশ্বাস ও দর্শন গড়ে ওঠে যা তার বলায় আর রচনায় ধীরে ধীরে আবাস পায়। লোকসাহচর্যে থাকার কারণে মানুষের অভিজ্ঞতার পথ ধরে লোকমানসে যে জ্ঞান লাভ হয় সেখানে থেকে একটি বিশেষ শ্রেণীর মনের গলিপথের সন্ধান করা যাইতে পারে। যেমন একজন চিত্রশিল্পির মনের ভাব আর এক চিত্রশিল্পিই বুঝতে পারে। এই যোগ আর চিন্তাসূত্রে বলতে পারি বাঙালি কবির মনকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- একটি হইতেছে তার কবিতার মন আর একটি হইতেছে তার ব্যক্তিমন। একটি তার সৃষ্টি-মন যা সে জন্মলাভে অধিকার করে আর একটি তার পারিবারিক, সামাজিক বলয়ের সাথে ঘর্ষণে জন্ম নেয়া মন যা সে ক্রমশ অর্জন করে। প্রথমটির উত্থান আর বিকাশ শিল্পরসবোধের রক্তকণিকায় আর দ্বিতীয়টির বিকাশ হয় কিছুটা কৃত্রিমভাবে, কিছুটা জৈবনেশায়, জীবের প্রাকৃতিক ইভোল্যুশনে।

তবে কিভাবে বাঙালি কবির মনটাকে আন্দাজ করি? বাঙালি কবির মনের গহীন ভাবগম্ভীর, রোমান্টিক, সৌন্দর্য উপসানাকারী দিকটার পাশাপাশি একটি ট্রাজিক রূপ বাঙলার আদি কবিতারূপ চর্চাপদে দেখতে পাই। যেখানে গরীব দুঃখী এক বাঙালি বৌদ্ধ কবি তার মনের অবস্থা এভাবে বলছেনঃ

টালত আমার ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী। ।
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধ কি বেন্টে ষামায়।

কবির এই অর্থনৈতিক দূরাবস্থা যে তার সামাজিক অবস্থানের কারণে ঘটে নাই এটি বলা যাবে না। অর্থ-রাজনীতি সকল কিছুর চাবিকাঠি না হইলেও এইটি যে পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক ভারসাম্যকে স্থিরাবস্থায় রাখার জন্য জরুরি-

তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অর্থ আর অর্থবাহিত শ্রেণীদোষে দূষিত সমাজে একজন কবি ভাবের রাজা হয়েও যিনি আবার মানুষও। তাকেও সওদা করতে হয়, ঘরে চুলা জ্বালানোর ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এই আত্মভোলা সংসার বিমুখ মানুষকে কাজ দেবে কে? তিনিই বা কিভাবে কাজ পাবেন? তার যোগ্যতা কী? কবিতা লেখা একটি মানসিক যোগ্যতা, ব্যবহারিক নয়। কতক মানসিক হইলেও তা দিয়ে কিছু করা যায় না সরাসরি। তাই অকেজো। তাই হাজার বছর ধরে 'কবি' এই মানসিকতায় গড়ে ওঠা বাঙালি ভাবুকের এই আর্কিটাইপাল দিকটিই বাঙলার আনাচে কানাচে ছড়ানো কবি, লোককবি, বাউল, ফকির সন্যাসি সবার একটি মৌল চরিত্রে রূপ নিছে। উপরের কবিতাটিতে কবির মনের দশা একটি ইনোসেন্ট সময়ের আর্তি হলেও, ঐতিহাসিকভাবে বাঙালি কবির মন যে শুধু ভাবমায়ায় পূর্ণ, আর কর্মে অবহেলা বা অনিচ্ছা- তাই যেন ধরে রাখে। এইটি কবি-ব্যক্তির নিজস্ব চরিত্রবলের কারণেই হোক বা সামাজিক রাষ্ট্রিক, হীন বাণিজ্যিক প্রথাপ্রতিষ্ঠার কারণেই হোক- কবি মানে দায়িত্বজ্ঞানহীন, কবি মানেই শূন্যতার চাষী- এই আর্কিটাইপাল কারেক্টারই সবাইকে একটা 'ফ্যান্টাসি' তে নিয়া গেছে যার দৃষ্টান্ত ও ফলাফল এখনো আছে।

যুগ পবির্তনের সাথে সাথে বাঙালি কবির এই সহজ সরল আত্মভোলা, অসংসারী মানসিক চরিত্রটি আর এক জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে নাই অবশ্য। সামাজিক বিবর্তন, শিক্ষার প্রসার, মুদ্রণ ব্যবস্থার প্রচলন, বণিক সমাজের উত্থান আর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ছদ্মআধিপত্যবাদি আয়োজনের পাশাপাশি, কবি তার ভাব ভাবনাকে শত সহস্র পাঠকের কাছে বিলি করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এতে তার কাছে অর্থ আসার পাশাপাশি আসছে পরিচিতি, স্বীকৃতি, ক্ষমতা, আর পদলাভ ও পদ ধরে রাখার লোভ। তাই এক ধরণের জাতিক-ব্যক্তিক স্বার্থপরায়ণাতার কারণে, প্রতিষ্ঠা আর প্রতিষ্ঠানের চাপে বা প্রভাবে কবির মন কখনো ছদ্মউদাসীনতা কখনো ছলচাতুরির দোলায় দুলিত। তার অর্জিত প্রতিষ্ঠা তার অদম্য কবিগিরির লিপ্সা আর প্রতিষ্ঠানের ছত্রছায়ার প্রতি তার দুর্মর টান তাকে এক প্রকারের জনবিচ্ছিন্ন পাগলই বানাইছে। আবার কেউ কেউ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের মেদ ও মেধা বিকিরণে সরাসরি অনুসারি না হোক, তার প্রাপ্ত নামডাক বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন লেখক কবি বা কবিযশঃপ্রার্থীদের এক ধরণের সিঁড়ি বা ঢাল রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে স্বক্ষম হইছে। এর মূলে যেমন কর্মবিচ্ছিন্নতা আর 'কবি' পদবীর সেই আদি অকৃত্রিম ফ্যান্টাসিতে বিশ্বাস কাজ করছে, সেইভাবে তার পারিবারিক ও সামাজিক অব্যবস্থা অস্বীকৃতি বা একজনের ইনকামে সবাই পরিবাহিত হওয়ার অথর্ব স্বেচ্ছাচারিতাও কাজ করছে। এরকম যদি অবস্থা

হয় তাইলে সেই মন শুধু অভাবই পাবে, স্বভাবের ভালো বা সৃষ্টিশীলতার কিছুই পাবে না বা দিতে পারবে না। তাই তার এই শূন্যতা তার মনে একটি সর্বকালীন কূটনৈতিক, আর্টিস্টিক সুবিধাবাদী দ্বিতীয় মানুষ তৈরি করে। এমতাবস্থায় তার মনের যে অবস্থা হবে তার মুখোশগুলিকে খুঁজে পাওয়া সমস্যা হবে না। যেমন সে হবে পড়ুয়া, জ্ঞানী, সৃষ্টিশীল রচয়িতা কিন্তু আসলে ছদ্মবেশি কপট ও মিথ্যাচারি। অবাক কাণ্ড যে বাঙালি কবির এই মন এমন একটি সর্বগ্রাসী বিকারগ্রস্ততা ধরে রাখে যে দশক পরম্পরায়, কবিতা পরম্পরায় তা চলতে থাকে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম তো আছেই কিন্তু তা এত কম যে আঙুলের মাপেও দেখানো যাবে না।

একে তো বাঙালি তারপর আবার কবি। এ যে বড় বিষম অবস্থা! একটি জাত আর একটি লেখক-পদবীপরিচয়। তাই দিয়াই বোঝা যায় মনের ভাবধারাটি কিভাবে চলবে, কী কথা বলবে। ঐতিহাসকভাবে বাঙালির কতগুলি চিরস্থায়ী অবদলযোগ্য অভ্যাসের খোঁজ পাওয়া যায়। তারা ভাববিলাসী কপট, অলস হিংসুট, আত্মপর অহংকারী, অনুদার পরশ্রীকাতর, নিংসঙ্গ হিংসাপরায়ণ, ইন্টেলেক্টচ্যুয়াল বেসমজদার ইত্যাদি। এই বিষয়টি জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দোহাই দিয়ে মাফ করা গেলেও, বাঙালির মানুষ হওয়ার কারণে কবি হিসাবে তার মনের বিশালত্ব দাবী করা না জায়েজ না। কিন্তু জাতিক বা জেনিটিক্যাল কারণেই হোক বা এই তেলশূন্য, খনিজশূন্য, গরীব অভাব অনটনের দেশে, দূর্নীতিগ্রস্ত শাসনপ্রশাসনের দেশে জন্মের কারণেই হোক বাঙালি কবি কিন্তু আজ নিজদোষেও দোষী। তাকে যে আজ কে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে এমন কোনো কবিবীর বা কোনো প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন নাই। এইটির একটি কারণ হইতে পারে যে কবি পেশাটি অবৈতনিক, কোনো রাষ্ট্রীয় বা দেশীয় আইন আদালতের কণ্ডিশনড না। যার কারণে এই দ্বিরাচারী অদ্ভুত মানুষেরা নিজের কাছেই জবাবদিহি করে, আড়ালে আবডালে নিরাপদে জীবনযাপন করে। লোক সমাজে কখনো মুখোশ উন্মোচিত হইলেও, তাদের কৌশলের কাছে আমপাঠক আবার বোকা হইয়া যায়। কারণ তারা জানে না যে - এই অদম্য বেকারবিলাসী, কাঁধে ময়লা ব্যাগ ঝুলানো, প্রায় পাগল, লম্বা চুলের ব্যক্তিটির সাথে কবিতা রচনার কোনো যোগাযোগ নাই। স্বভাব বা অভাব যাই বলি না কেন বাঙালি কবির মন আজ আর সরল উদাসীনতার মালিক না। চিরচলন্ত পরিবর্তনশীল গ্লোবালাইজেশনের যুগে তার শ্রেণীর আসনটি ধইরা রাখার জন্য- এই ছদ্মবেশি ইমেজ না আমল করলে তার আরামটি আর হয় না, তার গোষ্ঠীটোটেম তার সদা মদদকারী পার্শ্বঅভিনেতাদের পতাকা বহন না করলে তার চলে না। বাঙালি কবি কষ্ট করে যে আসনটি লাভ করছে সহজে সেইখান থিকা তাকে নামনো যায় না বা সে

সরতে চায় না পাছে লোকজন তাকে অবহেলা করে তাকে ফেলে নতুনকে পদস্থাপন করে! এই মধ্যবিত্তসুলভ পরজীবী মানসিকতা বাঙালি কবিকে দিছে আপাত একটি অদৃশ্য সুরক্ষা। সেখানে সে চিরকয়েদি নিজের তৈরি গোপন ঘরের ভেতরে জপমালা গুণে। তবে এখন এই অবস্থা অনেক পাল্টাইয়া গেছে। বাংলাদেশে তো লাখপতি, কোটিপতি কবি আছেন। বাঙালি কবি আজ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে থাকে, গাড়িতে করে কাজকর্মে যায়, লেপটপ আইপেডে কবিতা লেখে। কিন্তু তাই বইলা তার রক্তে প্রবাহিত অর্জিত মানসিক স্বভাবের তো পরিবর্তন হয় নাই। সেই যে শুরুতে সে ছিল কপট, ইর্ষাপরায়ণ, আর দশটা পাঁচটা রাজনীতি কর্মীর ন্যায় সুবিধাভোগী আজো সে তেমনিই আছে। সে চায় আরো স্বীকৃতি, সে চায় আরো নির্বাচন বা যতটুকু স্বীকৃতি পাওয়া গেছে তাকে মাজার বানাইয়া, সেইখানে মাথা মেধাহীন খিদমতকারীদের অপেক্ষায় থাকা আর কবিগিরি লালন করা। লাল সালুর মজিদের মতো লালসালু বা মোমবাতি নাইবা জ্বললো এই মাজারে!

২২/০৯/২০১১

পলাশী ও পানিপথ
কবিতার আলো নাকি থোকা থোকা রক্তজবা

সেই কবিতাগুলো কিভাবে রচিত হল! কিভাবে মোমের মত গলে পড়ল আমার কলমের নিব থেকে। কবিতার আলো নাকি থোকা থোকা রক্তজবা! আজো ভাবি। আমার ভাবনায়- কমলাপুর স্টেশন ছেড়ে, কোনো এক ভূতগ্রস্ত তূর্ণানিশিথা পাতালপথে চলে যায় কাগজের সাদা দিয়ে। আজিমপুর খেলার মাঠে এক পাগলা ঘোড়া দৌড় দিয়ে তার সহিসকে খুঁজে বেড়ায়। পেছনে পড়ে থাকে কোন সৈনিকের লাশ! মুখ তুলে দিখি সেতো আমার হারানো ভাই- সেহরান। ডাকি ভাই, ভাই। কোনো সারা শব্দ নাই। রক্তাক্ত জামা আর পাগড়ি। লিখলামঃ

অশ্রু নিঃস্ব করে
অবশিষ্ট আলো জেগে ওঠে
দূরবর্তীপথে। যেনো ইতিহাসেরমাঠ, ঘাসে রক্তচিহ্ন
ঘোড়া ছুটে গেছে জঙ্গল পার হয়ে
নদীজলে মৃতের ব্যথা,জানে একদিন কোনোদিন
ভূমির মুক্তি।
চারদিকে মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, ভাবে-- অশ্রুআমাদের
কবে আলোপথে নিয়ে যায়।
এতোদিন চোখে মুখে অন্ধকার- রাস্তায় ভ্রমণের চিহ্ন,
ভ্রমণ এমন করে যে বিশ্রামের দিন নেই
আহার প্রার্থনা সবকিছু পরবর্তী কালের
স্বপ্ন অসম্ভব শুধু কর্ম আর অভিলাষ
বিনাশের ভাষা।

(অবশিষ্টআলো)

এমন একটা সময় হয়ত যায় সবার জীবনে- যেখানে এক রক্তপিপাসু সৃষ্টিডাকাত বর্শা ছুঁড়ে কবিতা লেখায়। কোনোভাবে ফেরানো যায় না তাকে। ১৯৯৭/৯৮ সালের দিকের কথা। তখন একটা ঘোরের মধ্যে সময় কাটছে আমার। ডাক

বিভাগে চাকরি করি। মনে যা আসে তা অফিসের টেবিলে প্রথমে লিখে রাখি তারপর দৌড় দিয়ে পাশের রুমে কম্পিউটারে বসে টাইপ করি। কেউ জানে না সেসব কথা। পাশের রুমের আমার বন্ধু-কলিগ আবদুস সাত্তার কিছুটা জানত। করুণ সুরে কখনো হয়ত তাকে পড়ে শুনিয়েছি নতুন লেখা সেইসব কবিতা। তখন কবিতার আগুনে পুড়ছি আমি, আমার প্রতি পদক্ষেপে প্রতি শ্বাসে এক একটি কবিতা- বাতাস হয়ে উড়ছে, পাখি হয়ে বসছে আমার হাতে। আমি লিখলামঃ

কবিতার জন্য চির জাগরণ, নিদ্রা। আমার অপেক্ষা ভগ্নিপ্রতিম
সন্ধ্যায় নৃত্যপর মাছ। পথিক বাতাস জানে প্রতিভার খোঁজ।
অলক্ষ্যে তাড়িত ব্যথা একদিন তন্দ্রা আর আলোকে জাগায়
আলো ঢেউ খেলে খেলে আমার মাথার গান- প্রথম পালকে।

(চতুরাশ্রম- বাতাস)

অথবা

জলে ঢেউ উঠছে,আর আমি কবিতা কবিতা করছি
দেখছি-ভেসে ওঠা সরীসৃপের দেহে বাল্মীকির চিহ্ন।
জলে দাগ পড়ছে আমি অমৃত অমৃত করছি
দেখছি-সড়ক শেষে জললাইনে শাদা শাদা শিশু।

(বন্যাত্রয়ী)

আর একটি বিশেষ চিন্তা-কাঠামো আমাকে দখল করে রাখছে সারাক্ষণ। আমি যেন ঘর ছাড়া, আমার যেন কেউ নাই। আমি আমার এই পোড়া দেশ, মা মাটি, বাঙালি- তাদের ইতিহাস, তাদের সংগ্রাম, তাদের মুক্তি এসব ভাব ভাবনা নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছি। মানুষের রাজনীতি দেখছি, দেখছি তার ভেতরে লুকানো হাজারো শিকারীর মুখ। ইতিহাসের দিকে বার বার চোখ চলে যায়- দেখি ক্ষমতা-বাণিজ্য, সিংহাসন বদলের পাশাখেলা। জানলাম কিছুই বদলায় না। যে আসে সে তো নতুন নামে পুরনোকে নিয়ে আসে। লিখলাম-

জিজ্ঞেস করো। ঘোড়া হে উড়ন্ত অশ্ব, তোমার পিঠে কে ভাসমান।

জিজ্ঞেস করো। প্রর্বতক,পথিক অথবা গোপন রাজদূত কিনা।
জিজ্ঞেস করো। জিজ্ঞেস করো। কারণ সম্মুখে আমাদের গণজমায়েত।
কারণ এটি জানা দরকার আরোহীর আগুন আমাদের ভিটেমাটি
কতোটুকু পোড়াবে।

জিজ্ঞেস করো। হাতি,হেউজ্জ্বল ঐরাবত কতোদূর যাবে।
অথবা কাকে নিয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করো।
জিজ্ঞেস করো। কারণ সম্মুখে আমাদেও ভোজসভা।
কারণ এটি জানা দরকার কী সংবাদ ছিন্ন কওে দেবে
ক্ষুদিরামের কণ্ঠ।

ঘোড়া আসছে ঘোড়া যাচ্ছে। আমাদেও গ্রাম্যচুলি-ভরা
বিরামহীন বরফের স্তর।
ইংরেজ আসছে নবাব নামছে। আমাদেও পিতা প্রপিতামহের
সমাধি,কঙ্কাল।
আমাদেও পলাশী বলতে আমার একটি বোন
আদি অন্তে ভাতের থালা হাতে পথে পথে ঘুরছে
তার অনাগত সন্তানের নাম সিরাজদৌল্লাহ।

(পলাশী)

এসব কিভাবে আমার কবিতাভাবনাকে আক্রান্ত করল। কিভাবে লিখলাম--পানিপথ, সতীদাহ, বাঙলা ও বাঙালি, অবশিষ্ট আলো, চতুরাশ্রম, মহামায়া বা সমর্পণের কবিতা। তখন বাসা ছিল খিলগাঁও, মতিঝিল, শেষে আজিমপুর কবরস্থানের পাশে। একটু দূরে নিউমার্কেট, নীল ক্ষেত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ। তার পাশ দিয়ে আমি সিগারেট জ্বালিয়ে আসি, একা একা। কে আমাকে তাড়া করে, কার ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনি। রিক্সা চলে, লাফিয়ে লাফিয়ে আসে সেইসব লাইনঃ

দেহাবশেষ নিয়ে ফিরেছি ঘাটে। বংশচিহ্ন অপহৃত।
পরিচয় বলতে শুধু আধপোড়া নাভিখণ্ড
তার স্মরণে একলা মানুষ।
দূরে লালরশ্মি,আগুন। উত্থিত ঘোড়ার ফণা

মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রয়োজনে সেও অজগর।
নদী নদী শূন্য প্রবজ্যা। ঘূর্ণিজলে কানাইয়ের নাও
পাতালমুখো।
একদিন নিদ্রাশেষে ঘুটে কুড়োনির মেয়ে
ঘেমে ওঠা ভাতের হাড়ি স্পর্শ কওে দেখে
মাঠে মাঠে শস্যেও যুবক ভস্ম হয়ে গেছে।

(পানিপথ)

কেন লিখলাম সেইসব কবিতা। আমার ভেতরের কাউকে কি লিখলাম? নাকি এই যে আমার আমি, উদ্বাস্তু, হতভাগ্য দেশ আমার সহজ সরল মানুষের দল- তাদের স্বপ্ন - স্বপ্ন বিচ্যুতি, তাদের হাহাকার, আকুতি আমার কবিতায় অক্ষমের ক্রোধ হয়ে ভাষা পেয়ে গেল। আমি তাদের হয়ে- এভাবে রক্তাক্ত হলাম! কেন? সে কি আমার নিয়তি সে কি আমার সিসিফাস শাস্তি! জানি না। এক মহা জনগোষ্ঠীর সঙ্গী হয়ে, ইতিহাসের গাড়িতে সওয়ার হয়ে লিখলামঃ

জল হয়েছে আগুন
প্রথাপূর্ণ এই যমুনায় আজ হাড় পোড়ানোর গান।
নৌকা নেই। বুকে হেঁটে আগুনে করি আয়োজন।
আমার পথের ভগবান শেষ
সে অর্ধেকস্মৃতি হয়ে যেমন উড়ছে হাওয়ায়
তাও মৃত্যুগন্ধে বেগবান।
মহা জাগরণে যাত্রীগণ করে গান
হায় আগুন আগুন হলো যমুনার জল
পুড়ে যায় মৎস্যভাত ঘরে ঘরে সোনার পুতুল।

তুমি গৌতম বুদ্ধেও দেশে থাকো
তোমার সংসার ভরা ছাই।

(দেশাত্মবোধক কবিতা)

কবিতায় গানের বদলে এক স্বয়ংপ্রভ বাক্য আসল, ধ্বনি আসল, আসল ঘন গভীর ইমেজারি। মনোজগতের অবিরাম ম্যাজিক মিনার মাটি ঠেলা দিয়ে উঠে

দাঁড়াল যেন। এসব ঘটতে থাকল খুব মিহি সুরে। চিৎকার করছি কিন্তু কেউ শুনতে পারছে না। ভাষাটা হল লক্ষ জলের মিলনের পর, একটি শান্ত বুদবুদ।

ওরা চলে গিয়েছিল। ওড়ে ওড়ে আবার ফুলকির মত, ঘাড়ে
প্রাত্যহিক নিমপূর্ণা- আমাদের বেদনা।
আবার শক্তি বদল করে শীতের মহিমায় নদীর মত
চলে এলো। তখন উঠোনে শব্দ করে নীলাঞ্জনপাখি।
আমি কি তাকে পুনরায় চাই। যদি চাই,তাহলে সে আসেনা কেন!
তাই সকলে দিগম্বও অভিভূত তারস্বওে ডেকে ডেকে ক্লান্ত
ডাকি ভাইকে,বলি--পুড়েছো ভাই,তুমি ঘৃতভস্ম ছাই?
দেখি চারদিকে পড়ন্ত আলোর ফসল- জীবাশ্ম, ফসিল
বলি ভাই তুমি কি আবার নির্মিত হবে?

(চতুরাশ্রম- আগুন)

পলাশী ও পানিপথ
রচনাকাল-১৯৯৭-১৯৯৮, প্রকাশকাল- মে ২০০৯
মুদ্রণ- এবিসি কম্পিউটার্স এণ্ড প্রিন্টার্স
কাঁটাবন,ঢাকা- ১০০০।
প্রকাশক- সরকার আশরাফ, সম্পাদক, নিসর্গ
কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, বিএসএমএমইউ, শাহবাগ,ঢাকা-১০০০।
মূল্য- আশিটাকা

০৫/১০/২০১৩

কবিতা ও দুর্বৃত্তপনা

দুর্বৃত্তপনা আর কবিতা লেখা- দুটি দুই রকমের কাজ। ব্যক্তির দুর্বৃত্তপনা আছে কিন্তু কবিতার কোনো দুর্বৃত্তপনা নাই। ব্যক্তি-কবি একজন দুর্বৃত্ত হতে পারে কিন্তু তার লেখা কবিতা দুর্বৃর্ত্তপনা ধরে রাখে না। দুর্বৃত্তপনা একটি ঈভল ট্যাম্পারামেন্ট, সেটি একটি অপকর্ম সাধন করে- যার সাথে বেনিফিশিয়ারির রুটি রোজগার, আসন বাসন, মান সম্মান ইত্যাদি জড়িত। কবিতা-প্রতিভা এখানে নাই। তার মানে এর সাথে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীলতা আছে। আছে একটি সিস্টেমেটিক ব্যবহার, প্রচার আর বিস্তার। কিন্তু কবিতা সরাসরি কোনো রকমের সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ক্ষমতায়নের সাথে যুক্ত নয় বলে এটি দুর্বত্তপনার বাইরে। এটির সাথে জড়িত দুই জনের (দুর্বৃত্ত আর কবি) মনোসমীক্ষণ যাচাই করলে বলা যায় যে কবিতা লেখে, সে কতগুলি নেগেটিভ জীব আচরণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, আবার কিছু জীব আচরণ সে পায় তার পরিবার আর সমাজ থেকে। তার মন আর শরীরে এই জীব আচরণ সর্বকালীন বজায় থাকে, কিন্তু রচনাটি কবিতা হয়ে উঠলে কবি ব্যক্তির সেই নীচ আচরণ থেকে সে মুক্ত। তখন এটির কোনো ঈভল উদ্দেশ্য থাকে না বলে এটি কাউকে জড়িত করে না বা পারে না। এটিকে আমরা যথাযথ মূল্য দিই আর না দিই তাতে এটির কোনো কিছু যায় আসে না। কিন্তু যখনই তাকে কেউ স্বভাবের কষ্টিপাথর দিয়ে তার মূল্যবিচার করে, একটি সামাজিক স্থানে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তখনই এর কর্তা এর ভেতরে নিজের একটি ড্যুয়াল পারসোনালিটি তৈরি করে। তখন এর কর্তা নিজেই দুষ্ট বিচারক হয়ে এটির গুণবর্ধন বা গুণবিনাশ করে।

একটি কবিতার মুক্তপাঠে এক সময় এর ভালো মন্দ, শক্তি, দুর্বলতা নির্বাচন করা সম্ভব। কিন্তু কখনই এর কর্তার সামাজিক বা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনার মনোবাসনাটি পাওয়া সম্ভব হয় না। যেহেতু কবিতা অনেকাংশেই কবি-ব্যক্তির একটি মাস্ক এবং এটি অনেকাংশেই স্বয়ংপ্রকাশ, সেহেতু এটি কবি-ব্যক্তির কোনো সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করতে পারে না। কিন্তু এই কবি-ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত লাভ লোকশানের জন্য এই দুর্বৃত্তপনায় জড়িয়ে পড়ে একসময়। কবিতা-সাহিত্যে একদল দুবৃত্ত সর্বকালে, সর্বদেশেই ছিল, আছে এবং থাকবে। কারণ কবিতার সাথে অনাবশ্যকভাবে জড়িয়ে আছে কবি-ব্যক্তিটির জীব অস্তিত্ব ('অহং' যার নাম) আর কর্পোরেট-দানব শাসিত সমাজে

মনোপলি করার বৈশ্য মানসিকতা। এই দুটি কু-মন্ত্রণা থেকে যে অবস্থা তৈরি হয় সেখান থেকেই বাজারি কবি আত্মার এই অসুস্থ আত্মবিস্তারের কূট-কৌশল বজায় রাখে। আজ বাংলাদেশের কবিতা সাহিত্যে এই দুর্বৃত্তপনার এতোই সাফল্য মণ্ডিত বিস্তার যে আমাদের জাতীয় চরিত্রের মতোই এটি কবিতা-সাহিত্যের একটি সিস্টেম লসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সিস্টেম লসের কারণে কবিতা পাঠকেরা ভালো কবিতা আর মন্দ কবিতার চরিত্র নিধার্রণ করতে অপারগ, কবি আর অকবির মধ্য ফারাক করতে অক্ষম।

বাংলাদেশে এই ধরণের দুর্বৃত্ত আক্রান্ত সাহিত্যিক পরিবেশ আগেই ছিল। কারণ শিল্প সাহিত্যের প্রতিষ্ঠান-কেন্দ্রিকতা নিজে নিজে গজায় না, এর একটা বাহক থাকে, কারিগর থাকে। সাধারণত যারা ভাব ও ভাষায়, চিন্তা আর কল্পনায়, উদ্ভাবন আর আবিস্কারে কমজোর তারা এই চক্রে পা দেয়। তারা সেই দুর্বৃত্তপরায়ন 'অহং' তাড়িত হয়ে আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু আজকাল যে পরিমাণ চক্ষু লজ্জাহীন দুর্বৃত্তপনার পরিচয় পাওয়া যায় তা আগেকার-- ভালো লেখার কারণে 'বন্ধুহিংসা' সুলভ নিরাপদ দুর্বৃত্তপনা থেকে অনেক অনেক দূরে। আজকের এই দুর্বৃত্তপনা বেশি অর্গানাইজড বেশি মিলিট্যান্ট। বলা যায় বাংলাদেশে আশির দশক থেকেই কবিতায় এক ধরণের অর্গানাইজড, ব্রাক্ষণ্যবাদী চিন্তা ধারার বীজ রোপিত হয়েছে। তখন কয়েকটি ছোট কাগজ ঘেঁষা কিছু কবি ভারতের পশ্চিম বঙ্গের ৭০/৮০ দশকের কিছু কবির জীবন ও কবিতার অনুকরণ করে, কখনো তাদের যোগসাজসে নিজেদের একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালি দল তৈরি করে, আস্তে আস্তে মিডিয়ার বিভিন্ন শাখায় নিজেদেরকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, একরকমের কর্পোরেট শক্তিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয়। ওদের কেউ কেউ প্রতিভাহীন হওয়ার কারণে অচিরেই কলমরহিত হয়েছে বা একটি বদ্ধ পুকুরে আটকা পড়েছে বটে, কিন্তু নিজস্ব লিগ্যাসিকে ধরে রাখার খায়েশে, একটি স্ব-নির্মিত খলিফাপ্রথা শুরু করে দিয়ে যায়। আজ সেটি বহু শাখা প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে আরো বেশি ডাইনামিক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলাফতি শক্তি বিস্তারে আরো বেশি তৎপর। বাংলাদেশের কবিতা- সাহিত্যে আজ কেন এই দুযোর্গের ঘনঘটা, কেন এমনটি হচ্ছে তার উত্তর আমার কাছে নাই। তবে আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে যে সব সূত্র আবিষ্কার করলাম- তাই পাঠকের উদ্দেশে শেয়ার করতে চাই।

তিন তিনবার দূনীতির শীর্ষে থাকার কারণেই যে এই দেশে জন্ম লাভকারি প্রতিটি কবি-ব্যক্তি দুর্বৃত্ত কবিতে রূপান্তরিত হবেন এমন ভাবার কোনো কারণ নাই। অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ব্যক্তির ব্যালান্সড মানসিক বিকাশে অন্তরায় হতে পারে কিন্তু এটি প্রতিটি কবির শুভ বোধকে বিনাশ করতে পারে না। অস্ট্রেলিয়ার একজন কবি-ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত হতে পারেন (ইগো নির্ভর), কিন্তু যে কারণে বাংলা মূলকের একজন কবি দুর্বৃত্ত হবেন তিনি সে কারণেই হবেন না এটি নিশ্চত। আমি মনে করি বৃহৎ অর্থে বিষয়টির সাথে একটি জনগোষ্ঠীর জাতিগত স্বভাব চরিত্রটি জড়িত। বিভিন্ন ঐতিহাসিক, নৃতাত্তিক তথ্যাদি যাচাই করে বাঙালি জাতির উৎপত্তি, স্বভাব চরিত্র খেয়াল করলে বাঙালি জাতির চরিত্রে রক্তাক্ত, আত্মঘাতি ডাইকোটমির চিহ্ন বেশি পাওয়া যায়। বাঙালি যেমন বীরপ্রসু, স্বাধীনচেতা, আবেগপ্রবণ ও অতিথিপরায়ন জাতি ঠিক একইভাবে তারা প্রায় একটি দস্যু, আত্মকেন্দ্রীক, কপট, পরচর্চাকারী, পরধনলোভী, অলস স্বভাবের জাতি। তাই আশা করা যায় এই ডাইকোটমি কবি-ব্যক্তির মনে, স্বভাব চরিত্রে লুক্কায়িত বা কখনো প্রকাশিত অবস্থায় থাকবে।

সুস্থ সমালোচানার অভাব আর একটি কারণ। দীর্ঘদিন গোলামির অধীনে থাকার কারণে, একটি ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার আওতায় শিক্ষা গ্রহণের কারণে, কবি-ব্যক্তির ভাষায় আর মননে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস এর স্বভাব গড়ে উঠেনি, গড়ে উঠেনি বস্তুবাচক সমালোচনা করার চিন্তা পদ্ধতি। সুস্থ সমালোচনার অভাবে আমরা পাঠকেরা বুঝে উঠতে অক্ষম যে কোনাটা ভালো কবিতা কোনটা মন্দ কবিতা, কোনজন দুর্বৃত্ত কবি আর কোনজন শিষ্ট কবি। সমালোচক আছে কিন্তু অধিকাংশই সেই দুষ্ট দুর্বত্তয়ানের ভেতরেই বাস করেন বলে কবিতার সমালোচনা পক্ষপাতদুষ্ট, খলিফার মেজাজ মর্জি জাত। যদি একটি নিরপেক্ষ সমালোচনা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্টা করা যেত তাহলে এই পাঠক, কবি ও কবি যশোঃপ্রার্থীরা একটি স্বাধীন চিন্তা-পথ আবিষ্কার করতে পারত, মিছামিছি দলপতির মুখপানে চেয়ে দিন পার করত না।

ভারতীয় চিন্তাপদ্ধতি বীরপূজার ধারক। আমরা যা কিছুই ভাবি না কেন একজন বীর আমরা সব সময় চাই। তাই এই বীরপূজা মানসিকতার কারণে, অন্য একটি সম্ভাবনাকে দমন করার ঈভল ইচ্ছা পোষণ করি। আবার এই একই মানসিকতার কারণে বাঙালীর মানসে গণতন্ত্র চর্চার কোনো অনুশীলন নাই। তাই জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে অফিস আদালত, ঘরে বাইরে, পরিবার পরিজনে, সাহিত্য পরিমণ্ডলে এই দুর্বীনিত, দুষ্ট, দস্যু মানসিকতা বজায় আছে। গণতন্ত্রে

একটি কথা আছে --আমি তোমাকে ঘৃণা করি তা সত্য কিন্তু তুমি যা বলতে চাও তা আমি মৃত্যু দিয়েও প্রমাণ করব। এটির চর্চা নাই বলে দল আর বল নিয়ে সবাই সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার সহজ, সরাসরি পথে নামে।

অনেকদিন ধরে (১৯৪৭ সনের ভারত বিভাগের সময় থেকেই) বাংলাদেশের মানুষ একটি আইডেনটিটি ক্রাইসিসে ভুগছে- যা কিনা আমাদের জাতীয় মননে ও পরিচয়ে একটি গোপন অদৃশ্য চিন্তা-ভেদের দেয়াল তৈরির বড় কারণ। এটি একটি জাতিয় ব্যাধি। বাঙালি/বাঙলাদেশি মুসলমান/বাঙালি মুসলমান এমনতরো ছেলেমানুষি কূটতর্ক, ভাগ বিভাজনের নানান অন্ধ কানাগলি ধরে কাব্য-সাহিত্য মহলেও পরিচয় ভাগাভাগির চোরাবালিতে কবিরা পড়ছে। কবি-ব্যক্তি থেকে শুরু করে কবিসংঘ, কবিচক্র, মিডিয়ার কবিতাগিরি ভাগ হয়ে পড়ছে। সেখানে ছোট, বড় খলিফাগণের সুশীতল ছায়াতলে বয়স্ক কবি, ভবঘুরে কবি, বেকার কবি থেকে শুরু করে শিশু কবিটি পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা ঠুকে আছে। ভারি চিন্তামুক্ত এই অবস্থান!

মধ্যবিত্তসুলভ মানসিকতার প্রধান আকর্ষণ পদ দখল এবং পদলেহন। বাংলাদেশ একটি মধ্যবিত্ত/ নব্য উচ্চ মধ্যবিত্ত শাসিত সমাজ। এদের অধিকাংশেরই কোনো মূল্যবোধ, স্বাধীন বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা গড়ে ওঠেনি। তাদের কোনো ইমান নাই- না ধর্মে না সামাজিক নৈতিকতায়। ফলে তারা যে পদ সে পায় তা সহজে ছাড়তে চায় না, একটি বানানো মিথ্যা লোক লজ্জার ইতিহাসে বাস করে। তাই কবি-ব্যক্তিটি তার বানানো পদটির মর্যাদা আমৃত্যু ধরে রাখার চেষ্টায় কপটতা করেন। শাদাকে কালো, কালোকে শাদা বলেন।

তরুণদের বিরাট একটি অংশ বেকার, সেখানে কবিখ্যাতির পেছনে ছোটা কবি-তরুণ আরো বেশি বেকার বা ছদ্মবেকার। তাদের সামনে যে দরোজাটি একটু খোলা সেটি হল- নিউজপেপার, ম্যাগাজিন বা আজকের অনলাইন মিডিয়ায় ঢুকে যাওয়া। প্রতিভাবান তরুণ কবি নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা অনুসারে তৈরি খেলাফতের দিকে আগায়, তার বিচার বিশ্লেষণ যাচাই বাছাইয়ের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেই দুষ্ট দুর্বৃত্তচক্রে পড়ে যায়। তার আপাত কোনো মুক্তি নাই। তার চক্রের বাইরে সে আর কিছু দেখে না।

ব্যক্তি কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকার কারণে, অপর পক্ষকে বোঝা জানার ক্ষমতা হারায়। আত্মশক্তি জাগ্রত করার জায়গায় কাজ করে ভয়। এই ভয়ের কোনো সংজ্ঞা নাই, কারণ সেটি আসে একটি অন্ধকার থেকে। সেই ভয় থেকে আসে নিজের আশে পাশে একটি নিরাপদ দূর্গ তৈরি করা, আর কাউকে সেই দূর্গে ঢুকতে না দেওয়া।

বাংলাদেশে কোনো কোনো কবি সাম্প্রতিক ধারার কবিতাকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে- 'অবক্ষয়ী আধুনিক' নাম দিয়ে চৌদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে কবিয়ালি-সাহিত্য গোছের কবিতার চর্চা করে- বাংলা কবিতার আবহমান ধারাটির পুনর্জন্ম চান। কবি ও কবিতার মধ্যে ফ্যাসাদ তৈরি করতে চান। আমাদের বুঝতে হবে যে আধুনিকতাবাদী ধারণা সময়, সমাজ তথা মানুষের চিন্তা চেতনা বিকাশের স্বাভাবিক একটি ধারা। পৃথিবীর ঘূর্ণন আর বিস্তার যদি স্বাভাবিক হয়ে থাকে তাহলে, মানুষের চিন্তা কল্পনা আর সভ্যতা তো এক জায়গায় দাড়িঁয়ে থাকবে না। পরিবর্তন আসবে সব জায়গাতে। দরজা জানালা বন্ধ করেই তো আর আমরা পৃথিবীর হাওয়া বাতাস থকে পালাতে পারব না। এই যুগপরিবর্তনকারি দীক্ষা থেকে গুরু বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ মাইকেলও বাদ পড়ে নাই, পড়ে নাই শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ বা আবুল হাসানও। আজ আমরা যে 'দুষ্ট' আধুনিকতার পাঠ করি তা মূলত খণ্ডিত ও একপেশে। সত্যি যে আধুনিকতাবাদের দ্বিতীয় ধারাটি(আল্ট্রা প্রগ্রেসিভ)- মানুষকে কিছুটা ব্যক্তি-ভজনার দর্শন দিয়েছে, তাকে দলবদ্ধতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে, তার যৌক্তিক অবকাঠামো দুর্বল করে তাকে দানবে,পাগলে রূপান্তরিত করেছে। কিন্তু তার হাত ধরেই মানুষের মননে আর চিন্তায় এসেছে প্রশ্ন ও সন্দেহ করার, গ্রহণ আর বর্জনের দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার হাত ধরেই পরে পোস্ট মর্ডানিজমের সিন্থিসিস কনসেপ্ট কার্যকর হয়েছে-- যেখানে আমরা বর্তমান আর ভবিষ্যতের হাইটেক ফাইবার গ্লাস সুপারসনিক ই-টেক জর্জড়িত সভ্যতা আর সংস্কৃতির সাথে মানুষের অতীত, মানুষের ঐতিহ্য আর ব্যক্তিগত বিশ্বাস, রাজনীতি, লোকাচার ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে এক জায়গায় আনতে পারার সুযোগ পেয়েছি। আমরা আধুনিকতার সৃষ্ট সবকিছুই নেব, তার হাওয়া বাতাস খাব কিন্তু তাকে নিয়ে কোনো লেখালেখি করব না, তাতো হতে পারে না। আর যে দল কবিয়ালি-সাহিত্য টাইপের কবিতা লিখে বাংলাদেশের কবিতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা চিন্তা করেন, যারা ভাবেন যে কবিদেরকে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে, তথা হাটে ঘাটে গ্রামে গঞ্জে ফিরে যেতে হবে, তাদের কথা লিখতে হবে- তাদের কাছে আমার প্রশ্ন বাংলাদেশের কতজন মানুষ কবিতা পড়ে? গ্রামের কতজন আর শহরের কতজন? একটু চিন্তা করুন। কবিয়ালরা যা লেখেন সেগুলি তো গান বা গীত, সেগুলি সব সময় একটি বিশেষ

চিন্তায় ক্লোজড হয়ে থাকে। সেগুলিতে ধর্মদর্শন, জীবনদর্শন বা সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টির সম্পর্ককে জানার গোমর আছে কিন্তু কবিতার প্রাণ, কবিতার বহু ব্যঞ্জনাময় প্রকৃতি, কবিতার সেই মেজিক্যাল ইমাজিনেশন -সেখানে অনুপস্থিত।

আমাদের দেশে ডাইনামিক পাঠক্ষমতাচক্র গড়ে উঠেনি বলে আমরা কবি ও কবিতা নির্বাচনে আমাদের বন্ধু বা বন্ধু সমান কোনো এক আত্ম-স্বীকৃত নেতা কবির কাছে আমাদের নির্বাচন ছেড়ে দেই। তার ফলে বিচারের ভুল দুষ্ট দর্শনে আমরা পা দিই ও খন্ডিতকরণ বা বাক্সবন্দি করার দুষ্টবুদ্ধিতে মত্ত হই। আজকালের বেশির ভাগ তরুণই পৃথিবীর ছড়ানো ছিটানো কবিতাগুলি পড়ে না, ওরা নিজের কবিতার উপর বন্ধুদের লাইক আর ভালো লাগার স্পর্শ পেয়ে মনে করে তারা তরী ভিড়িয়ে ফেলেছে। তাদের আর কোনো কিছুর জানা আর পড়ার দরকার নাই, কোথাও যাওয়ার নাই। পড়াশোনা বা ক্রিটিক্যাল অন্যালাইসিস এর অভাব থাকাতে ওরা একটি কবিতার ভালো, মন্দ বিচারও করতে পারে না। আর যারা পারেন, তারা সেই আবহমান কালের কপট স্বভাবের কারণে, দলপতির ভয়ে চুপ করে থাকেন।

সবেশেষে বলব -প্রকৃত কবিদের এই কবিতা-সাহিত্য দুর্বৃত্তপনা সম্পর্কে সচেতন থাকা ভালো, কিন্তু তাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নাই। কারণ দুর্বৃত্তপনা একটি অন্ধকার, একটি সিস্টেম লস। যারা এই চক্রে আছেন তারা প্রাকৃতিক কারণেই নিজেরা একদিন স্তব্ধ হয়ে যাবেন বা খেলা থেকে ইস্তফা দেবেন। পাঠকের শিক্ষা দীক্ষা, দৈহিক ও মানসিক সাস্থ্যের উন্নতি ঘঠলে এসব অন্ধকার আর থাকবে না। তখন একটি লাইট হাউজ না হোক একটি মোমবাতি নিয়ে কেউ এসে হয়ত সামনে দাঁড়াবে। ততদিন পর্যন্ত একটি অপেক্ষা চলতে পারে।

০৫/০১/২০১৩

কবির নিজের বাড়ি বা নতুন কবিতার পথ

পৃথিবীর বিমূর্ত, বাইনারি ধারণাগুলি যেমন- ভালো/মন্দ পছন্দ/অপছন্দ রুচি/অরুচি ভদ্র/অভদ্র সুন্দর/অসুন্দর শূন্য/পূর্ণ ইত্যাদির যখন একটি ইতি ও নেতিবাচক অস্তিত্ব আছে বা শব্দগুলির একটা আপেক্ষিকতা আছে, তখন এই নিরীহ গোবেচারা কবিতার ভালো/মন্দ বিচারটাও আপেক্ষিক হয়ে পড়ে। কারণ সেও ব্যক্তি-পাঠকের রুচি, শিক্ষা, মূল্যবোধ তার সময় তার পঠন-ঐতিহ্য ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বা তার প্রভাবাধীন। মানে এই বিচারের সূত্রটা বিচারকের মানসিক ও শারিরীক অস্তিত্ব তার ফিজিক্যাল-মেটাফিজিক্যাল বোধনিরেপেক্ষ নয়। কিন্তু তবুও আমরা কতগুলি অনির্ধারিত, অসংজ্ঞায়িত কিন্তু সমাজকর্তৃক নির্দেশিত নয় পুরোপুরি, এমন রুচিবোধের কারণে কিছুটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি কোনটা ভালো আর কোনটা মন্দ কবিতা। কবিতা তো কবিতাই তার ভালো হওয়া মন্দ হওয়া নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের কোনো মাথাব্যাথা নেই। কিন্তু আমাদের রক্তকণিকা, অনুভবের জীন কবিতার ডি এন তে পরিপূর্ণ বলে আমরা সেই দলে নেই। আমরা আজো কবিতার কবিতা হওয়া নিয়ে কিছু সময় অতিবাহিত করতে পারি, কবিতটিকে উপলব্ধি করতে পারি। এর জন্মকালীন স্মৃতিকথা, এর ইনোসেন্সকে স্পর্শ করতে পারি।

কবিতা কী? কিভাবে একটি কবিতার জন্ম হয়? এই অতি পুরানো দুটি প্রশ্নের উত্তর এতো বহুমুখি ও বিভ্রান্তিপূর্ণ যে- পৃথিবীর ধ্বংসকালীন মুর্হূত পর্যন্তও মনে হয় এর কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা পাওয়া সম্ভব হবে না। কবিতার ভাষা আমাদের সমাজশাসিত বা বই পুস্তক বা শাস্ত্রনির্দেশিত, বিদ্যালয় উৎপাদিত ভাষা ঠিক নয়। আবার এটির বাইরেও নয়। কবির মানসিক-বাস্তবতার অনুভবটাকে যে ভাষায় নির্মাণ করা হয় তার সবটাই একটা অনুদিত ভাষা। কারণ কবি তার সেই কবিতা-অনুভবটা বর্ণনা করতে যেই ভাষাই আশ্রয় নেন না কেন, তার এই 'হওয়া পর্বটা' তার প্রথম ভাষা- অদৃশ্য ইন্দ্রিয়জ মূহুর্ত- যেমন দেখা, স্পর্শ, ঘ্রাণ, অনুভব এবং পরবর্তীতে ভাব, চিন্তা, ইত্যাদিও মধ্য দিয়ে অনুদিত হয়ে তার মাতৃভাষায় (বাঙলা, ইংরেজি, আরবি, ফরাসি ইত্যাদি) শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। তাই পাউণ্ড, এলিয়ট,ইয়েটস,মালার্ম, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, আল মাহমুদ বা আজকের আবেগে থরো থরো কাঁপা নবীন কবিপর্যন্ত- যে যাই বলুক না কেন, কবিতা কারোই সংজ্ঞা নিয়ে মাথা ঘামায় না। ওরা কবিতা সম্পর্কে যা বলে তা অনুমান নির্ভর, দেশ বিদেশের কবিতাপাঠ-অভিজ্ঞতা নির্ভর বা নিজস্ববিশ্বাস,

সমাজদর্শন আবার কখনো রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্ভর। এসব থেকে আমরা সাধারণেরা কিছু ধারণা পাই মাত্র, কিন্তু কবিতা রচনা করতে পারি না। কারণ কবিতা প্রথমে নিজে নিজে হয় মানে 'স্বয়ংপ্রকাশ', কাউকে কাউকে ধরা দেয়, সবাইকে দেয় না। যাকে ধরা দেয় সে তো প্রথমে ঘুমন্ত শিশুর মতো নিষ্ক্রিয় কেউ, তার উপর ভর করা এই ভাবগ্রস্ততা যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে তাকে শুইয়ে দিবে, নষ্ট করে দিবে তার অন্য সব দুনিয়াদারি। দুনিয়ার আর কিছু তার আর ভালো লাগবে না। এই যে হননপ্রিয়, আত্মবিস্মৃতির সৃষ্টিকাল- তাকে কী নামে ডাকব? তাকে কোন সাজে সাজাব? এই যে ডাকা এই যে ভিন্ন সাজে সাজানো সবকিছুই করতে হয় একটি বিশেষ মূহূর্তকে ধরেই। তার হয়ে ওঠার মধ্যে কোনো বিশেষ কবিদের কথা কাজে লাগে না বা মনে আসে না। যদি এরকম হতো তাহলে তো সবাই একটি সূত্র বের করে কবিতা লিখে চলত। তাই বলি মন নিজের ভাবকে অনুভব করো, প্রাণকে শোনো আর নিজের ভাষায় সাজো। কিন্তু তাই বলে যে একেবারে পড়াশোনা, জানাশোনা ছেড়ে আমার মত করে কবিতা লিখতে থাকব, তাতো হবে না। কারণ কবিতার ভাষায় একটা অদৃশ্য চেইন আছে, আছে উত্তরাধিকার। সেই চেইন ধরেই আরো চেইনে বা আরো নতুন নতুন চেইনে প্রবেশ করা যায়। সাথে লক্ষ্য রাখতে হয় কবিতা হওয়ার ভাষায়, তার এক্সপ্রেশনে, তার শূন্যতায় আর শূন্যতা পুরণে, যুক্তি এবং যুক্তিহীনতার সামগ্রিক সমন্বয়ে। আর কবি এই কাজটি করে একা একা। একজন কবি শেষ পর্যন্ত একাই থাকে। এমনকি যে কবি দ্রোহবাদী- মিছিলের কবিতা লেখে তাকেও তো একটি নিরিবিলি জায়গায় গিয়ে কলম ধরতে হয়। অবসরে আপন মগ্নতায়, নিজ প্রতিবিম্বের কাছে প্রায় নগ্ন হয়ে কবিতা লিখতে হয়। কারণ কবি 'তুমি সেই নার্সিসাস। '

২

কবিতা অনেক রকমের হতে পারে- ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, আত্মজীবনীমূলক, যুদ্ধবিরোধী, মানবতবাদী, ধর্মীয়, রসঘন প্রেম বা বিরহের কবিতা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এর মধ্যে আর একটি ধারা থাকে যা ঠিক কোনো তৈরি মতবাদ বা ইজমের বাহক হয় না, বরং পৃথিবীতে ছড়ানো ছিটানো, লুকানো দানের ওপর চোখ মেলে, তাকে এক ঋষীয় ধ্যানে অনুভব করে, ভাষার এক যাদুময়তায় প্রকাশ করে। এইসব বিষ্ময়ভরা, ধ্যান ধারণার কবিতা পাঠকের মনে এক একটি আলোফোটা অভিজ্ঞতার মতো ধরা দেয়। এই প্রচ্ছন্ন মগ্নতা থেকে অধিকাংশের মতামত পাওয়া যায় যে, কবিতা হল সেই না-দেখা, না-বোঝা, না-পাওয়া কিছু যা পরিস্ফুট হওয়ার জন্য এই জন্মমৃত্যু, স্বর্গমর্ত্য, আকাশবাতাস, বস্তু, অবস্তুজাত

প্ররোচনার গহীনে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তাকে দেখার, পাওয়ার একটি আবেদন থাকে, বেদনা থাকে। এক ধরণের ক্রমাগত অবসেশন থাকে, যা নিজেকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চেতনার আধারবাটি করে তোলে। যে খোঁজে সে পায়, এই খোঁজাখুঁজিতে নিজেকে হারিয়ে আবার নতুন করে আবিষ্কার করে পায়। প্রথমে মূহূর্তের একটি প্যাসিভ সারেন্ডার থেকে চেতনার বিভিন্ন স্তরে ক্রমাগত অ্যাকটিভ-অ্যাকশন, তারপর এই যে পাওয়া, পাওয়া থেকে মানব-ভাষার সাথে শহীদি যুদ্ধ, তার পথ ধরেই কবিতার জন্ম। আর এই যে আমাদের চারপাশে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের ভাষা, সেটি এতোই উন্মুক্ত ও ব্যাখ্যাত যে এর দানটুকু আর সৃষ্টিময় হয় না।

পৃথিবীকে নুতন চোখে দেখা, এর বস্তু-অবস্তু, এর প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক নিসর্গমনে এক নুতন ধারণা, নতুন যৌবনচেতনা- কবিতা কামকাতরতার স্পৃহা জাগায়। পৃথিবীকে দেখার নতুন চোখ পাওয়ার সাথে নতুন কবিতার ভ্রুণ বিস্তার, ভাব ও ভাষার সাথে সংগমের পর কবির ভেতর একটি আবছা ফীটাসের জন্ম হয়। ধারণার আগে নতুন কবিতা হয়না- আর তার একটা ভাষাও লাগে, ভাষা আসে তার হাত ধরে। পুরাতন জ্ঞান, পুরাতন বিশ্বাস এবং তার থেকে ক্রমশ ইতিহাস হয়ে যাওয়া স্টাইল বার বার কেবল মরা, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত কবিতারই জন্ম দেয়। কারণ এইসব পুরাতন এই ভাষাগোলকের ভেতর ধরে থাকা বহুল ব্যবহৃত অনুশাসনকে মান্য করে সেখানেই ঘুরে ঘুরে নিঃশ্বেষ হয়ে যায়। একজন নতুন কবি সহজেই এই গোলকে আটকা পড়ে যায়। কেননা তার চারপাশটা এসব নিরাপদ, স্টেরিওটাইপড কবিতাপ্রণালীতে সয়লাব। আর একদিন যখন নতুন ধারণা হল, নতুন চিন্তার স্ফুরণ ঘটল, দেখা আর অনুভবের ধারা গেল বদলে, তখন লেখা শুরু করা যেতে পারে একটি কবিতা। প্রশ্ন আসে- কী লিখব আর কী দিয়ে লিখব? আমাদের চারদিকের বাস্তবতায় যা সরাসরি আছে যা এমনিতেই প্রকাশিত, তাকে কি লিখব? নিত্য প্রাত্যহিকতার ঘুর্ণিজলে যা বলা হয়ে গেছে সহস্রবার, হাজারবার তাকে কে শুনবে বলো? এই নিটোল সুন্দর ফাঁদে যে আটকা পড়ে আছে সে কবিতার আর কিছুই তো গড়বে না জানি। কবিতা তো সেই লুকিয়ে রাখার খেলা, আড়াল করার স্টেজ, পূর্ণতাকে শূন্য করার বাজি। সে একটি যাদুময় ভাষার আড়ালে এই নিত্য বাস্তবতা, এই নিষ্ঠুর প্রামাণিকতা, এই জগৎময়তা লুকিয়ে রাখে। পাঠক ধীরে ধীরে স্তরগুলি খোলে, ভাঙ্গে, নিজের ভাবানুষঙ্গের সাথে মেশায়। এই তো মুক্তি,পাঠক আর কবির মুক্তি। মুক্তি থেকে আসে উপলব্ধির অপার স্বাধীনতা। আমাদের এই চির পরিচিত ঘাস, ফুল, নদী, পানি, আকাশ, বাতাস কবিতার মালমসলা হিসাবে বা একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড হিসাবে

আসতে পারে, কিন্তু কোনো ক্রমেই প্রধান বিষয় হিসাবে আর নয়। যে কবির জীবন শুরু হল, এই ব্যাখ্যাত, এই সংজ্ঞায়িত প্রকৃতি ও নারীর প্রেম আর তার অপার সৌন্দর্য বন্দনায় আমি নিশ্চিত সে কবিতার কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে।

৩

পৃথিবীতে সব কিছুরই একটি গঠন আছে, একটি ভীত আছে। মানুষের শরীরকে যেমন হাড় একটি অবলম্বন দেয়, তেমনিভাবে কবিতারও একটি গঠন বা ছাঁচ লাগে- যার ওপর ভর করে কবিতা দাঁড়ায়। কিন্ত শুধুমাত্র হাড়ের সুবিন্যাস্ত ক্র্যাফ্‌টম্যানশিপ যে মানুষকে মানুষ আকার দেয় না, তাকে বাঁচার বা চলার কোনো শক্তি দেয় না, তার জন্য যেমন একটি প্রাণ আর রক্ত লাগে, তেমনিভাবে কবিতার ফর্মের সাথে প্রধান জরুরি বিষয় তার প্রাণ, তার রক্তকণিকা। কবিতার এই প্রাণ হচ্ছে- কবিতার ভাব, চিন্তা, কল্পনা ও কবিতার বিশেষ নতুন ভাষাভঙ্গি। আবার কবিতার জন্য শুধু ছাচঁ তৈরি করলেই শেষ হল না, তার সাথে প্রয়োজন কিছু ভাষাটেকনিক- যেমন অনুপ্রাস, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক, পান, এপিগ্রাম, চিত্রকল্প, ছন্দ ইত্যাদি। এইসব টেকনিকের মধ্যে যেটি কবিতার সহজাত তা হল এর সাথে আসা একটি দোলা বা ছন্দ। একটি শব্দকে উচ্চারণের গতি ধরে এই দোলার সৃষ্টি হয়। এই বিশেষ দোলাকে আবিস্কার করতে হলে একজন কবিকে তার কানের প্রিকোয়েন্সিকে বাড়িয়ে দিতে হয়। পড়ার সময় কোথায় উচ্চারণে কানে খটকা লাগছে কি না-তীক্ষ কান তা বলে দেয়। কারণ কবিতার নির্মাণ চায় প্রকাশিত ভাব আর প্রবাহিত ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে একটি ব্যালান্স। তাই মনে যা আসে তাই কবিতা আকারে বলার কোনো স্কোপ নেই। এই ভাব আর তার সাথে আসা দোলাটাকে কেউ কেউ বাঙলা কবিতার প্রধান তিন ছন্দের একটিতে বাঁধতে পারেন, আবার নাও পারেন। এটি সম্পূর্ণই কবির ইচ্ছা। এর মধ্যে কোনো জোর জবরদস্তি চলে না। কারণ কবিতা একান্তভাবে, প্রথমত কবির একটি বিমূর্ত ভাব, একটি হঠাৎ হয়ে ওঠা ধরেই জন্ম লাভ করে বলে এর প্রধান অবলম্বন কবির কল্পনাবিষ্ময় আর কবির ভিশন, শব্দের ধ্বনি তাল লয় নয়। একটি নির্ধারিত নিয়ম যা কবিতার তাল বা লয় নির্ধারণে সহায়ক- তা কবিতার মর্যাদা বিধানে ক্যাটলিষ্টের ভূমিকা পালন করতে পারে না, এটি একটি কবিতার শক্তিকেও পরিচয় করিয়ে দেয় না। কবিতার শক্তি কবিতার বিশেষ প্রকাশে, তার অনাবিষ্কৃত ভাষার বিস্ময়ে। সমাজ বা যুগ পরিবর্তন তথা মানুষের মস্তিস্কে চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের সাথে সাথে ভাষা সম্পর্কিত স্ট্যাটিক- এই ছন্দ প্রয়োগের ধারণাও পাল্টায়। তাই এটি কোনো কবিতার প্যাটেন্ট নিয়ে কবিতার এক চেটিয়া

অধিকার দাবী করতে পারে না। আসলে যে বিষয়টি দেখতে হবে সেটি হল- কবিতাটি কোনো বিশেষ অনুভূতি(যা কিছুটা হঠাৎ করে প্রাপ্ত)এর উপর দাঁড়ালো কি না, কবিতাটি পাঠে পাঠকের কানে বাঁধা না পেয়ে তরতর করে এগিয়ে গেল কি না। কারণ কবিতা একটি ক্যাওটিক ভাব-ভাবনার মধ্যে সৃষ্টি হলেও এর প্রকাশপ্রতিষ্ঠান নিশ্চিত হয় এর একটি নির্ভার উপস্থাপনার ওপর। তাই শাস্ত্রীয় ছন্দ হোক বা কবির সতস্ফূর্ত ভাষাবাহনের কারণেই হোক- একে দিতে হবে একটি মসৃন গতি। কবিতা নির্মাণে ছন্দ একটি বিবেচনার বিষয়, কারণ শুধু ছন্দ দিয়েই কবিতা লেখা যায় না। যদি তাই হতো তাহলে বাংলার ছন্দের অধ্যাপকেরা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় কবি হয়ে পড়তেন। কবির প্রাথমিক ভিশন(একটি স্বপ্ন, বস্তু বা অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত একটি ইম্পালস থেকে উদ্ভূত একটি বিশেষ অনুভূতি)পাওয়া থেকে কবির ভেতরে প্রথম একটি কবিতা-বীজের জন্ম হয় তখন সেই কবিতার ভাষা সেই ভিশন, তার সেই ড্রিমি আলোবিন্দুর ওপর ধীরে ধীরে তার ঘরবাড়ি তৈরি করে। কবির ভিশন পাওয়ার মুর্হূতের সাথে কবিতার এইসব টেকিনকের একটি গভীর কিন্তু অদৃশ্য বিনিময় সম্পর্ক, একটি শর্তহীন মিলনপ্রক্রিয়া ঘটে থাকলে একটি রচনা ভালো কবিতা হয়ে উঠতে পারে। কবি জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেন ও ঘোড়া কবিতা দুটি এরকমের। ছন্দ নয়, তার এই বিশেষ ড্রিমি, ভিশন পাওয়া পরিবেশনের জন্যই তার এই দুটি কবিতা আমাদের কাছে এক বিস্ময়ভরা অভিজ্ঞতা। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে তিনি পৃথক আর সমকালীন ফর্ম ও টেকনিকনির্ভর কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত থেকে হাজার গুনে বড় কবি। আমাদের কালের, ২০১১ সালে সাহিত্যে নবেল বিজয়ী সুইডেনের কবি টমাস ট্রান্সট্রমারও এই ঘরাণার কবি।

বাংলা কবিতার শাস্ত্রবাহিত, ছন্দপ্রণালী ইস্কাইলাসের নিয়তি তাড়িত নিষ্ঠুর ভাষা-কৌশল যেন। কবিতার স্থির কোনো সংজ্ঞা নির্দিষ্ট না হওয়ার কারণে, প্রাচীন যুগের যুদ্ধগাথা তথা পৃথিবীর ক্রমশ আগুয়ান ফিজিক্যালেটির উত্থানকে ধরার জন্য শব্দ উচ্চারণের মধ্যে যে স্ট্রেস আন স্ট্রেসের দোলা শুরু হয়ে গিয়েছিল তার হাত ধরেই- ধীরে ধীরে শাস্রবাঁধা এক ধ্বনিকৌশল- ছন্দ বা না-ছন্দ এই ধাঁধাতেই অতীত ও বর্তমান কালের কত কবির কবিতার বীজ, এমন কি জীবনও নষ্ট হল! আশ্চর্য লাগে। আসল কথা হল বর্তমান পৃথিবীর সেই আদি জৈব, শৈশব-অবস্থা এখন আর নেই যে তার থেকে উৎসারিত ছন্দ লীলাতে সবাইকে নাক কান দিতে হবে। এক সময় ছিল যখন দর্শক শ্রোতা মনোরঞ্জনের জন্য সুরে সুরে, শব্দে শব্দে ভারসাম্য রক্ষা করে কবিতা বা গান লেখা হত। হাজার বছর ধরে তাই চলছিল। তখন ছিল গীতিকবিতার যুগ, চারণকবিদের যুগ। বিষয় ছিল

রাজা বাদশাহ, সিপাহশালারদের যুদ্ধ বীরত্বের কাহিনি বা নারী রূপের রগরগে বর্ণনা। চরণে চরণে মিলাতে হবে, দর্শক শ্রোতাকে দিতে হবে আনন্দ এই ছিল বেশির ভাগ কবিতার মোকাম । তাই বাঁধা ছন্দে, নৃত্যের দোলায় দুলত কবিতা। ভাবনার বিস্তার বা একটি চিত্র বা দৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলার সেই ম্যাজিক্যাল ভাষা পৃথিবীতে তখনো তৈরি হয়নি বা কবিদের জানা ছিল না। সেই সময়টাকে কবিতা পেরিয়ে আসতে পেরেছে মনে হয়। এই সময়ে ব্যবহৃত, শাস্ত্র নির্ধারিত, এই টেকিনক- রসের দাবি বা ঐতিহ্যের দাবির নামে যখন কবিদের একমাত্র ধ্যান ধারণার বিষয় হয় তখন এটিকে একটি বিশাল বাহুবলীয় কৃত্রিমতা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। এই কৃত্রিমতার জোরটাই কবিতার আরাধ্য সেই ইমাজিনারি/মিস্টিক্যাল উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে এটিকে একটি ইন্টারটেইনিং শো-পিস করে ফেলে। খুশির কথা এই যে এখন ব্যক্তির সামাজিক ও মানসিক অবস্থানের ওপর নুতন পৃথিবীর মুখ, তার ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা জল, রৌদ্র, আলোছায়ার স্বতঃস্ফূর্ত দোলা ক্রমাগত বাড়তে থাকায়- পাঠকদেরজিবে মনে হয় পরিবর্তনের স্যালাইভা আসতে শুরু করেছে। ভাবতে হবে যে কবিতার শব্দ বাক্য, এর দোলা সবার আগ থেকেই কবির মনে তৈরি হয়ে আছে। কবিতার'হয়ে ওঠা' যখন কবির মর্মমূল স্পর্শ করে যায়, তখন এমনিতেই কথাগুলি একটি স্বাভাবিক রিদম নিয়ে আসে। তখন সেইভাবে ভাবকে, শব্দকে বিন্যাস্ত করতে হয়। কবিতা যখন তার স্রষ্টাকে ছাপিয়ে জেগে উঠছে, তখনতো সে তার স্বরূপ নিয়েই জেগে উঠছে আপনা আপনি। তাই দেখতে হবে কিভাবে নতুন আইডিয়া নতুন ভাবে বলা, ভাব-চিন্তা- ভাষার সাথে মিশে গিয়ে একটি ন্যাচারল ফিগার আর সাউণ্ড তৈরি করে- যাকে দেখতে আর শুনতে ভালো লাগে আমাদের।

তাই নতুন ভাষা দিতে হলে কবিকে পুনঃজন্মগ্রহণের দৃষ্টি দিয়ে নিজেকে আর নিজের চারদিকের ঘটনাকে বুঝতে হবে। তাহলে নতুন কবিতা হবে। যদি কেউ রাতারাতি এটি দেখতে চায় তাহলে এটি সম্ভম নয় হয়ত। কারণ মানুষের রুচিবোধ, জ্ঞান অভিজ্ঞতার স্তরে পরিবর্তনের বাতাস লাগতে সময় লাগে। আর নুতন দৃষ্টি পাওয়া কবিকে এখনকার এই মুহূর্তে জন্ম নেয়া প্রাণের মতো, তার উপস্থিত পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তার শব্দ অনুসঙ্গ উপকরণ স্টাইল সংগ্রহ করতে হবে। আর যতটকু তার অতীতমূখি যাত্রা ততটকু শুধু তার সাংস্কৃতিক-জীনগত উত্তারাধিকারের উপর নির্ভর করবে। মানে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য আপনা আপিনিই তার লেখার দেহে, শব্দে বা চিত্রকল্পে, মানুষের শরীরের ভেইনের মতো

থেকে যাবে। তাকে আলগা করে দেখার বা আনার কোনো কৌশল কবিকে অবলম্বন করতে হবে না।

৪

বন্ধুগোষ্ঠী নিয়ে আড্ডা, অবসর কাটানোর জন্য বা বেকার সময়কে একটি রঙীন আকার দেয়ার জন্য ভালো। ব্যবসায়ী মন্ত্রী,এমনকি পকেটমারদের জন্য আরো ভালো। কিন্তু কবিতার মতো এমন একটি নির্দলীয়, নিঃসঙ্গ আর্ট নিয়ে অতিরিক্ত বন্ধুবাজিএকটি ভয়বহ মনোরোগ। সেয়ানা মানুষেরা এটি ঘন ঘন করে, কেবলমাত্র কবি ছাড়া। কারণ এই দলবদ্ধতার মাধ্যমে তারা নিজেদের ফন্দিফিকির, ধান্দাবাজি করতে, কোন প্রতিষ্ঠিত অযোগ্যকে কতটুকু তৈলমর্দন করে বড় করে ধরা যায়, অথবা কোন আগুয়ান শিষ্যসৈনিককে যথারীতি পুরস্কারের কলা হাতে দিয়ে, নিজের রাস্তাটুকু গালিচাবহুল করা যায়- এইগুলিই এখানে চলে। কবিদের জন্য এই উদ্দেশে বন্ধুবাজি বা দলবাজি করা মাকরুর কাছাকাছি। এই কথা এই জন্য বল্লাম যে দলবাজিতে একজন নিম্নমানের কবিও তার শক্তির প্রকৃত চরিত্র ধরতে পারে না বা কোথায় তার দুর্বলতা সেটিও টের পায় না। দলের সদস্যবৃন্দের গুণগান গাইতে গাইতেই তার প্রতিভার বারোটা বাজে। সে অচিরেই শেষ হয়ে যায়। আবার যে কবি নিজেকে বড় ভবছে বা তাকে নিয়ে সঙ্গীসাথিরা ভাবে- তার আপাতত প্রচার প্রসারপুরস্কার পদদখল বা একটা ছদ্ম সেলিব্রিটি চরিত্র দাঁড়ায়হয়ত। কিন্তু সেটি খুবই চোরাবালির মতো, সেখানে পড়ে এই বড় কবিওএকদিন পথ ও পাথেয় সবই হারান। একজন প্রভাবশালী কবি অন্য আর একজন প্রতিভাবান কবির কবিতাকে আড়ালে রাখার কূটকৌশল অবলম্বন করতে পারেন, তলে তলে ভীষণ শত্রুভাবাপন্ন হতে পারেন। কিন্তু তিনি চিরদিন তাকে দাবিয়ে রাখতে পারেন না। একইভাবে একজন কবি রাজনীতিক হতে পারেন কিন্তু কবিতা লেখা রাজনীতি নয়। (রাজনৈতিক কবিতা বা রাস্তার কবিতা সবসবই ঝুঁকিপূর্ণ কবিতা। ব্যতিক্রম কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতা। এই কবিতাকে কেউ কেউ রাজনৈতিক আখ্যা দিয়ে তার কাব্য-ঐশ্চর্যকে বিনাশ করার চেষ্টা করেন। সমালোচকের দায়িত্ব ছিল এটির নতুন ভাষাগত, নির্মাণগত তথা নতুন চিন্তা চেতনার যুগ সৃষ্টিকারী আয়োজনকে সাধারণ পাঠকদের কাছে তুলে আনা। বাংলাদেশের কাব্যের ইতিহাসে ‘বিদ্রোহী’র কাব্যিক ভাষা-বিদ্রোহ ক্যামোফ্লাজ করে জনগণের মুক্তির গান হয়ে, তাৎক্ষণিক হর্ষবিষাদের উদহারণ হয়ে থাকলো শুধু!) এই প্রসঙ্গে বলে রাখি-কবিদের সংঘবদ্ধতা জরুরি পড়াশোনা, ভাব, আউডিয়া আর ভাষাব্যবহারের সূত্রের সাথে, সংঘের সাথে নয়। । যে কবি একা, যে কবি নিজেকে চেনে, একে একে খুলে

ফেলছে নুতন নতুন দরোজা, দরোজার ভেতর আলো-অন্ধকারের গহীন গহীন খেলা, সে তো একটি বিরাট দল নিয়েই বসে আছে চারদিকে। তার তো কোনো গোষ্ঠীর প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে, বাংলাদেশসহ যতো সংঘ আর ফ্যানক্লাব আছে তার সবগুলিই করছে এক ধরনের দুর্বল আর তৃতীয় শ্রেণীর কবি সাহিত্যিকেরা।

৫

একটি বিশেষ বিষয় বা থীম ধরে ধরে কবিতা নির্মাণের প্রয়োজন আছে কি না- এটি ভাবার সময় এসে গেছে। আমরা দেশের শিক্ষার হারের সাথে পাঠকের চিন্তার অগ্রসরতা যদি মাপি তাহলে একটি ভুল করবো। যারা কবিতার পাঠক তাদের পঠনক্ষমতার সাথে দেশের শিক্ষাহীনতার সম্পর্ক কম। যারা কবিতার পাঠক তারা শিক্ষার কারণেই কেবল কবিতা পড়েন না। কারণ কবিতা ব্যাবসবাণিজ্যের জন্য নয়, তার সিলেকশনটা হয় নান্দনিক কারণে। যাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এই জিনিষটি নেই, সে যতই বি, এ, বা এম, এ, পাশ বা অধ্যাপক বা বিজ্ঞানি বা আরো কোন উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করুক না কেন- তাতে কবিতার পাঠক বাড়ে না। কারণ সবাই যেমন কবি নয় তেমনি সবাই কবিতার পাঠক নয়। বাংলাদেশের মানুষ তো আরো নয়। শিরোনামের চেয়ে বা বিষয়ের চেয়ে তার আশপাশ দিয়ে যে ছবিগুলি ঘুরছে, আগুন ছড়াচ্ছে, যে অন্তরঙ্গ সৃষ্টি ঝিলিকসমূহ মাথার টানেলে ঢুকে,সহস্র রাস্তার গলি গুপচি একবার দৃশ্যমান আর একবার অদৃশ্য করে তুলছে, তার কিনার থেকেই কবিতার জলসত্রটি ধরা যায়। একটি বিশেষ বিষয় বা থীমকে মনে রেখে, নাম ঠিক করে কবিতা লিখেত বসা কাজ হিসাবে হয়ত ভালো,তাতে একটি স্বঘোষিত কবিতারচনা হয়ে যায় হয়ত, কিন্তু কবিতাসৃষ্টি হয় না নিশ্চিত। কারণ কবিতাকে প্রথম পাওয়ার স্পর্শটুকু থেকে ধরতে হলে তাকে একটি টোটাল জন্মগ্রহণের স্বাদ নিয়ে ধরতে হয়। যেভাবে একজন প্রসূতির গর্ভে ফীটাসের আগমন ঘঠে, ঠিক সেই ভাবে ধীরে তার হাড় মাংস রক্ত ভেইন চোখ চুল সব শেষে স্কিন এসে লাগে। তাই প্রথমেই তার পুশটা সে খাবে, ঝিলিকটা সে দেখবে, কিন্তু তাকে পুরোপুরি দেখবে না বলে তার নাম বা বিষয়ও সে এখনো জানে না। নির্মাণকালীন মূর্ত-অমূর্ত, শূন্যতা-পূর্ণতা, আধা প্রকাশ, আধা আড়াল এইসবের মাঝখানে কোথাও হয়ত কবিতা-শিশুর চেহেরাটি তৈরি হয়ে আছে।

৬

কবির একটি কবি-আইডেনটিটি তৈরি করা নিয়ে তোড়জোর একটি ভ্রান্ত ইগোসেন্ট্রিক পাবলিসিটি ছাড়া আর কিছু নয়। কবির আইডেনটিটির সাথে মিথ হয়ে বসে থাকা কবির কবিসুলভ আউটলুক বা ইসেন্ট্রিক আচার আচরণ, আসল কবিতা থেকে অনেক অনেক দূরে। (জীবনানন্দ দাশের সেই ছবিটি দেখলে তাকে কবি বলে সনাক্ত করা যাবে না! আর এখনকার নির্মলেন্দু গুণকে দেখলে কবি নামের সেই মিথিক্যাল ছবিটির কথাই মনে আসে। প্রশ্ন- কে প্রকৃত কবি?) কবিতা লেখা শখ নয়, কবিতা লেখা একটি সিরিয়াস কাজ। সাধনার কাজ। কবিনিজেকে চেনানোর জন্য বা কবিতাগিরিকে জানানোর জন্য কবিতা লেখে না, কবি কবিতা লেখে নিজের জন্য, নিজের সৃষ্টিতাড়িত মনোবাসনার কারণে। শুধু কবিতাকে আবিস্কার করে, কবিকে কেউ নাও জানতে পারে। আর কবিতা আর উপন্যাস এক জিনিস নয়, উপন্যাস সরাসরি পাঠকমুখি। কবিতার পাঠক থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। আর এই পাঠক বিশেষ কে? পাঠক একটি ধারণামাত্র। কারণ পাঠকসাধারণের কোনো অবজেকটিভ চরিত্র নেই বা লক্ষ্য থাকে না। বেশির ভাগ পাঠকই কবিতা বিচার করে কবিতার ইউটিলিটি দিয়ে, তার তাৎক্ষণিক সামাজিক উপযোগিতা নিয়ে। কবিতাকে সে কবিতার প্রয়োজনীয়তা দিয়ে দেখে, তার হওয়াটাকে বাদ দিয়ে। তার ভেতরে লুকানো নতুন সৌর্ন্দয এলাকা অথবা তার পাগলামি, আপাত অ্যাবসার্ডিটি পাঠকের কাম্য নয়। তাই জনমুখরতা বা গণমুখি ইত্যাদি নাম দিয়ে কবিতার দায়বদ্ধতার নামে কবিকে এক ধরণের আপোষকামী করে তোলে, যার ফলে কবিতার নিজস্ব চলা ব্যাহত হয়।

ওপরের কথাগুলি সহসাই কোনো নতুন কবিতার জন্ম হয়ত দেবে না। কিন্তু একটি পথ হয়ত এখান থেকে পাওয়া যেতে পারে। পথ কবিকে চলার পথে তৈরি করে নিতে হয়, চলতে চলতে যেমন আমরা এক সময় হাইওয়ে পেয়ে যাই। কেননা অনেক পথের ভেতর থাকা বা অন্যের আবিষ্কৃত পথে হাঁটার চেয়ে নতুন একটি পথ পাওয়া কবির জন্য জরুরি। কারণ কবি কারো ভাড়া করা বাড়িতে বেশি দিন থাকতে পারে না, তাকে এক সময় একটি নিজের বাড়ি তৈরি করে নিতে হয়।

১৫/১১/২০১২

কবিতার দায়বদ্ধতা

কবিতার দায়,কবিতার অঙ্গীকার, এসব কথা বেশ চালু আছে। আছে একটি সামাজিক দায় মেটানোর দাবি। তাকে আমরা দেখি বা না দেখি, স্বীকার করি বা না করি, সেটি পাঠকের দরবারে বেশ ঝেঁকেই বসে আছে। সেই মোতাবেক প্রশ্ন আসে- কবিতা একটি শিল্প মাধ্যম হিসাবে আমাদের কাছে কিভাবে দায়বদ্ধ? আসলেই কি কবিতার কোনো দায়বদ্ধতা আছে? এটি কি শুধু ভাবের বিমূর্ত রূপ বা চিন্তা-কল্পনার অ্যাবসার্ড ভাষাখেলার শিল্প? নাকি এটি আমাদের মনে এমনভাবে দানা বাঁধবে যে আমরা বস্তুর দৃশ্যমান উপস্থিতি আর তার প্রকৃত বাস্তবতার মধ্য পার্থক্য আবিষ্কার করে, আমাদের জ্ঞানকে সত্য দৃষ্টি দিতে পারব। মানুষের মধ্যে তৈরি কৃত্রিম শ্রেণী বিভাজনের সত্যমিথ্যার ফারাকটা বুঝে উঠতে পারব। আমার 'আমি'র অন্ধকার জায়গাটিকে আলোকিত করতে পারব বা সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক শোষণ শাসনের দুষ্টায়নকে চিহ্নিত করতে পারব। পারব ইতিহাসকে পুর্নবিবেচনা করতে, সমাজের জুলুমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে। পারব সাম্য আর ন্যায় ভিত্তিক একটি সমাজ তৈরি করতে। এদিক থেকে চিন্তা করলে দুটি পাঠক দলের কথা আমাদের মাথায় আসে। প্রথম দলটি কবিতাকে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ, স্বাধীন সত্তা ভেবে এর টেক্সটকে বিশ্লেষণ করে এর নান্দনিক মূল্যের উপর গুরুত্ব দেবেন, তাকে সৌন্দর্য-অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে তাৎক্ষণিক আনন্দ কুড়াতে চাইবেন। কবিতার আনন্দটি কবিতার ভেতরে 'হয়ে ওঠা জগৎ' থেকে পাবার চেষ্টা করবেন। আর দ্বিতীয় দলটি কবিতাকে কবির ব্যক্তিগত বোধ বা অভিজ্ঞতার বাইরে রেখে এর সাথে জড়িত সামাজিক বয়ান তথা এর মাঝে বাস করা সমাজ, সমাজের সাথে রাষ্ট্রের সাংঘর্ষিক সূত্র, এর শত্রুমিত্র চিহ্নিত করণের উপর গুরুত্ব দেবেন। দেখবেন এ-থেকে মানুষের বা সভ্যতার উপযোগী, মূল্যবান কিছু পাওয়া যায় কিনা। এই দুটি দলের বিশ্বাস কোনটা কতটুকু গ্রহণযোগ্য- এটি বিচার না করেও বলা যায় শিল্প যেহেতু সময় এবং স্থান পরিবেশ ছাড়া বা ঐতিহাসিক পূর্বাপর সম্পর্ক ছাড়া এমনিতেই লিখিত হয় না, তাই এর নান্দনিক মূল্যের সাথে এর সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা আপনা আপনি চলে আসে। তাই কবিতা লেখা হয়ে যাওয়ার পর যখন এর পাঠমূল্য তৈরি হয় তখন লেখক-পাঠক সেখানে একটি প্রচ্ছন্ন ভ্রাম্যমাণ কোর্ট নিয়ে বসে থাকে। সেখানে ওরা কবিতার সৌন্দর্যতত্ত্বের সাথে ব্যক্তি-জীবনের প্রায়োগিক দিকটাকে বিচার বিশে-ষণের আওতায় রেখে তাকে বন্দি করেন বা মুক্তি দেন। বন্দি করেন মানে এর ব্যবহারিক মর্যাদাটাকে তার অভিজ্ঞতার সাথে মিশিয়ে নেন- তাই এর কার্যকরি দিকটার গুরুত্ব বাড়ে। মুক্তি দেন মানে একে নিজের আর্কিটাইপ পঠন-

অভিজ্ঞতা থেকে ছেড়ে দিয়ে একে শুধু ভাষা-খেলা বা শিল্পের কাছে শিল্পের দায়বদ্ধতা এমন আপাত সীমাবদ্ধ বিবেচনার কাছে সঁপে দেন।

একটি কবিতা কেবলমাত্র যদি কবির খুব ব্যক্তিগত একলা একটি নির্জন বাড়ি সম্পকির্তও হয়, তাও হয়ত শেষ পর্যন্ত তার ব্যক্তিগত অবস্থানের সাথে তার সামাজিক মিথস্ক্রিয়া, তার অভ্যন্তরীণ ঈসথেটিক ভ্যালুর তার বাহ্যিক সংগ্রামমূহ প্রথমে বিমূর্ত, পরে বোধগম্য অবস্থায় একটি সাংকেতিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হতে চায়। বাড়িটি যদি একটি স্মৃতি হয়ে থাকে বা একটি ধারণা হয়ে থাকে তা হলেও এর বাড়িবোধের সাথে সাথে এর বস্তুনির্ভরতা এর ভেতরের মানুষজনের সাথে সামাজিক সম্পর্কগুলো তার নানাবিধ মুখ মুখোশ নিয়েই উঠে আসে। কারণ আমরা এরকম চেতনার কবিতার ভাষা আমাদের সামাজিক জিনে নির্ধারণ করে নিয়েছি। একটি অদৃশ্য ভাষা লাইব্রেরি তৈরি করে নিয়েছি- যেখানে এই দায়বদ্ধতার মাস্টারেরা গোপন নির্দেশনা দিয়ে পাঠকের পাঠকত্বের কিছু ট্যাবু তৈরি করে দিয়েছে। তাই মানুষের সামাজিক ভূমিকার সুত্র ধরেই এখানে কবিতার টার্গেট-ভাষা পাকাপোক্ত হচ্ছে। আমরা হয়ত টেরও পাই না।

আমাদের ব্যক্তিগত রুচি যাই থাকুক না কেন, এটি দায় দায়িত্বের পক্ষ বিপক্ষে থাকুক না কেন- এই দাবীর মুখটি মানুষের কৌমতাড়িত, ব্যবহারিক সত্য অভিজ্ঞতা হিসাবেই লুকিয়ে থাকে। অন্তত পক্ষে কিছু পাঠকের কাছে চিরদিন। একে আমরা পাঠকের রুচি বা পঠন-শিক্ষার অবমূল্যায়ন হিসাবে চিন্তা করে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে পাঠকের এই রুচি, শিক্ষা তাদের একটি পঠন-ঐতিহাসিকতাকেই নিদের্শ করে যা হাজার বছর ধরে আমাদের বাছ বিচারকে প্রভাবিত বা প্রতারিত করছে। তাই এটি আসলে পাঠকের মনোজগতের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা তার সামাজিক দায়বদ্ধ অবস্থানকেই চিহ্নত করে। সত্য যে বিশ্ব বাজার ব্যবস্থার আগ্রাসী বিস্তার আর প্রভাবের কারণে আমাদের মনোজগত আজ একটি করুণ ভোক্তায় পরিণত। আমার সামনে যা আছে আমি তার উপযোগিতা মান্য করি, তাকে কেজো বানানোর আশায় তার লাগা না লাগার সত্তায় বিচার করি। তাই দুভার্গ্যজনকভাবে কবিতাকেও এই ব্যবস্থার মধ্যে যেতে হচ্ছে। তাকে সম্পূর্ণ একটি কনজ্যুমার কালচারের মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু কবিতা তো এসব শুনবে না, পরওয়া করবে না। সে পাচিল ভেঙ্গে পালিয়ে আসবে বা পাচিলের ওপরই ঘাস হয়ে জন্মাবে, জাগোয়ার হয়ে চাঁদকে হানবে। সামাজিকভাবে মানুষের অস্তিত্ব, কৌমবদ্ধতার সামুহিক বিপর্যয়, রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক বা ভিনদেশি আক্রমণ ইত্যাদির কারণে কবিচৈতন্য

যতই জর্জড়িত হোক না কেন। এতে কবিতার কোনো যায় আসে না। কারণ কবিতা রচিত হওয়ার পর তা একটা আলাদা সত্তা যা একান্তই কবির গোপন, সুপার কনশাসনেস থেকে বেরিয়ে আসে। মানে তার ভাষা একটি পর্দার আড়ালের ভাষা, তার ভাষা একরকমের 'নাই' ভাষার মতোই যা ক্রমাগত ভাব ও ভাষার মধ্যে বিদ্যমান টেনশনকে সংজ্ঞায়িত করার জন্য কখনো শূন্যতা কখনো সেই 'গ্যাপ'কে ভরিয়ে তোলার জন্য সংকেত, চিহ্ন, শূন্যতার ভেতর দিয়ে কবি চৈতন্যকে যেতে হয়েছে। এর খবর কেউ রাখুক বা না রাখুক, এতে কেউ মাথা দিক বা না দিক এতে তার কোনো লাভ ক্ষতি হয় না।

কিন্তু আসলেই কি তাই? মানুষের কবি-সত্তা কি এই সামাজিক, বাহ্যিক বস্তুরাশি, প্রতিষ্ঠান, সভ্যতা আচার আচরণ ছাড়া? সে কি রাজনীতি ছাড়া? সে কি এই চারপাশ ছাড়া, দোকানপাট ছাড়া, বাস ট্রেন ছাড়া? তার 'আমি' স্বভাব যে বিশ্বাস, অভ্যাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে- এইগুলির সাথে তার অন্য 'কবি-আমি'র কি কোনো যোগাযোগ নাই? কবিকে যদি একটি রক্ত মাংসের মানুষ হিসাবে চিন্তা করা যায়, যদি তাকে এই বস্তু বাচকতার মধ্যখানে দাঁড়ানো আলাদা একটি সত্তা হিসাবে চিন্তাও করি, তাহলে তো তাকে তার যেমন ভেতর, তেমনিভাবে বাহির নিয়ে, তার সম্পূর্ণতাকে নিয়ে বিচার করতে হবে। কবি সচেতনে হোক আর অবচেতনে হোক, কবির গহীন সত্তা তার ব্যক্তিগত স্বাভাবিক গতি অগতি, তার সামাজিক দেয়া-নেয়া, চিন্তাচক্র থেকে দূরের নয়। সে যা ভাবে- যেখানে যা ভাবে, যে পরিস্থিতিতে ভাবে তার একটি অবয়ব আছে, আছে আকার ও আধার-বাটি। এটি ধীরে ধীরে একটি কবি সত্তার কাছে একটি আবছা প্রতিবিম্ব তৈরি করে। তাই হয়ত তার সৃষ্টি তার কাছ থেকে দূরের বা অ্যালিনিয়েটেড নয় একেবারে।

কিন্তু পাঠককে এটিও আবার মনে রাখতে হবে যে কবিতার ভাষা সরাসরি কোনো সামাজিক ভাষা নয়, 'চাঁদের আলো গলে গলে যায়' বা 'জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়' এই ভাষা নিয়ে আমরা সামাজিকতা করি না। কবিতা মানুষের কল্পনা ও শুদ্ধ চিন্তাজাত, অজানা অদেখা অপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু সকল সম্ভাবনার একটি ভাষা-দরোজা। তাই কবির দায়, কবির কবিতা-ভাষার ঐতিহাসিক দায়িত্ব-ধারণা থেকেই আসে। কবি সামাজিকভাবে যে কাঠামোতে বেড়ে উঠেন, যে ভাষায় কথা বলেন, যে দেশে তার অস্তিত্ব তার দেশ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় তার চেতনা(কনশাসনেস) গড়ে ওঠে। সেই মোতাবেক ফিলিস্তিনি কবির সাথে একজন ব্রিটিশ বা আমেরিকান বা জাপানি কবির, বাংলাদেশের কবির সাথে অস্ট্রেলিয়ার

কবি এমন কি একই বাংলা ভাষার দেশ ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কবির কবিতার চিন্তা, বিষয় এবং ভাষার মধ্যে একটি পার্থক্য থাকে। এখানে কবিতার ভাষা একটি ভূমিকা রাখে সত্য, কিন্তু ভাবের আগে ভাষা তো আসে না। যে ভাব আমার মনে দেশ, কাল, বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক মুহূর্ত সহকারে আগে থেকেই জিন্দা হয়ে আছে, আমার শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে ধীরে ধীরে আমার কবিচেতনায় দানা বাঁধে, তার হাত ধরেই তো একটি কবিতার ভাষা তৈরি হয়।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে অনেক কবিতা আছে যেগুলি এই দুটি সম্ভাবনাকেই একত্রে ধরতে পেরেছে। যেমন কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতাটি। এই কবিতাটির মধ্যে কবিতার দুটি সত্তাই- শিল্প ও সামাজিক দায়বদ্ধতা লতাপাতার মতো জড়িয়ে আছে। এটি যেমন কবিতার চরম শিল্প মূল্য- যেমন ভাষাগত ও টেকনিকের পরাকাষ্ঠা মিটিয়ে দিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে এটি কবিতার সামাজিক দায়বদ্ধতার মোক্ষম একটি পাঠ হিসাবে তৈরি হয়েছে। বাংলা ভাষা তথা বিশ্ব কবিতার অঙ্গনে একটি মিলিট্যান্ট কাব্যভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু একটি গভীর পাঠে এই বিষয়টি শুধুই উপরের একটি আচ্ছাদন মনে হতে পারে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন একটি উপলক্ষ্য মাত্র, আসল কথা এটি একটি অ্যান্টি-পোয়েম। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রোমান্টিক পেলবতা ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তু আর আপাত সরল এক রৈখিক চিন্তা আর কল্পনার বিরুদ্ধে এটি শুধু অন্যান্য বিপ্লবী ধারার কবিতা হিসাবে দাঁড়ায়নি, এটি তখনকার কবিতাচিন্তা ও ভাষার বিরুদ্ধে একটি বিশেষ কবিতাভাব ও ভাষাযুদ্ধ। কবির সামাজিক 'আমি' যেমন আমরা মানে সমষ্টির আমি, তেমনিভাবে কবিতার 'আমি' মানে ভাষা-বিদ্রোহী, প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর ভাষার উল্টা দিকে যার যাত্রার আর এক আমি। আবার মনে করুন জীবনানন্দ দাশের সেই 'বোধ' কবিতাটির কথা। আধুনিকতার প্রথম 'শহীদ' এই কবি যতই কবিতাকে আড়াল করে তার মরবিডিটি তার অনিকেতের সাধনা, মানুষের আস্তানা মানুষের সংঘ থেকে স্বেচ্ছা নিবার্সনের অবস্থানটির কথাটি বলতে চান না কেন, শেষ পর্যন্ত এটি মানুষের হারিয়ে যাওয়া সংঘবদ্ধতাকে ফিরে পাওয়ার বেদনাক্লান্ত অস্তিত্বকেই প্রকাশ করে। 'মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন/ মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন/শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!' তিনি তার অন্যান্য লেখায় কবিতার সামাজিক মূল্যকে কবিতার শিল্পমূল্যর বিনিময়ে হীন মনে করতে চান না কেন- তার কবিতায় ঘুরে ঘুরেই এক হারানো মানবের কথা শোনা যায়। মনে করুন সেই বিনাশি লাইন-- 'আলো- অন্ধকারে যাই-- মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয়,-- কোন এক বোধ কাছ করে!/স্বপ্ন নয়--শান্তি নয়-- ভালোবাসা নয়/ হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!'

এরূপ সুপার আমিত্ব তাড়িত আধুনিক মানুষের 'বিং অ্যন্ড নাথিংনেস' জনিত অন্ধ কাতরতা থাকলেও কবিতাটি শেষ পর্যন্ত মানুষের ছিটকে পড়া কৌম-স্বভাবের কথাই হাজির করে। বিশ্বযুদ্ধজাত কু-রাজনীতি ও অর্থনীতির নেতিবাচক প্রভাবের কারণে মানুষের মহান ট্রাজিডির কথা, হেমলেটিয় সন্তাপ আর দ্বিধার নিচে চাপা পড়ে আছে মানুষ আর এই মানবতাড়িত সভ্যতার কাছে চলে যাবার চোরা আকুলতা। তার 'বনলতা সেন' কবিতায় হাজার বছর ধরে যে পথিক হেঁটে যায়- এটি আসলে কে? এটি যেন কোনো পথ হারানো পথিক! তার পরম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে-- পরমের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য ঘুরছে, ঘুরছে। মানুষের সাথে সেই পরমের বন্ধন প্রতিষ্ঠা কল্পে একটি আপাত শান্তিপথের সন্ধানে যাত্রী হচ্ছেন। যেখানে যেতে পারলে এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া 'রুহ' তার প্রার্থীত স্রষ্টার কাছাকাছি আসল পরম শান্তি খুঁজে পাবে। বনলতা সেন কী? বনলতা সেন একটি আইডিয়া, একটি আশা, মানুষের হারানো আর্থ-প্যারাডাইস- যা একটি নারীময়ী সত্তায় পৃথিবীর সবুজ কল্যাণঘর আর তার ভেতরে শান্তিবাতি জ্বালিয়ে রেখেছে। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ তাকে খুঁজছে। পাগলের মতো। তাই আড়ালের আড়াল- কবিতার আসলে একান্ত নেগিটিভ বৈনাশিক কোনো আড়াল নাই, কবিতা সব সময় ভাব আর ভাষার হাতধরে, ভাষান্তরে ঘুরে ঘুরে তার কৌমের কাছে ফিরে আসে। ফিরে আসে সোনালি কাবিন নামে, আসাদের সার্ট হয়ে, জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছকে পিছনে ফেলে চক্ষুষ্মান, সমাজবাদি মানুষের কাছে, পলাশী ও পানিপথে।

তারপরও তো কথা থেকে যায়। কবিতার আর একটি চিকন ভেইন পাওয়া যায় তার শরীরে যেখানে সে একা একা আলো আঁধারিতে যায়, রৌদ্র করোটিতে বসে, কাফকার জামা পরে, মর্নিং গ্লোরি দেখে, নো ম্যানস জোন পেরিয়ে যায় - নিজেকে চেনার নিজেকে জানার আশায়। কোথাও সেই অস্তিত্ববাদী নায়কদের মতো পড়ে থাকে নক্ষত্রের নিচে- ঘাস হয়ে আকাশের ওপারে আকাশ হয়ে। কখনো নার্সিসাসের মতো নিজের প্রতিবিম্বের কাছে নিজেই আপ্লুত হয়, হয় বৈনাশিক। আমরা ভাবি এইগুলির অর্থ কী? এই আপাত প্যারাডক্স আসলে মানুষের স্বভাবজাত- সেই হাবিল আর কাবিলের মতো- এক দিকে শান্তি আর এক দিকে রক্তপাত। 'এটি' না 'অন্যটা' ইত্যাদি স্ববিরোধী ভাবনা হয়ে, একটি ঝুলন্ত ধাঁধা হয়ে, আস্তে আস্তে নিজ অস্তিত্ব জানান দেবে এই কঠিন পৃথিবীর কাছে। এই যে পৃথিবী যেখানে বিশ্বজিৎ নামের বা এমন আরো তরতাজা যুবককে ঘাতকেরা চাপাতি দিয়ে মেরে ফেলে, বাসের মধ্যে কোনো এক অসহায় দামিনিকে পশুরা বলৎকার করে! তাই কবিতার নগ্নতা তো শুধুই শিল্প দিয়ে ঢাকা যাবে না।

কবিতা সময় আর সভ্যতার ভাষা নিয়ে এক পাশে আগুন আর এক পাশে পানি নিয়ে আমাদের কাছে জেগে উঠবে।

টি. এস. এলিয়ট ব্যক্তিগত আবেগ-- যা কেবলই ব্যক্তির নিজের ভেতর থেকে অনায়াসে বের হতে থাকে, তার থেকে শিল্পকে মুক্ত করার কথা বলেছেন। বললেন- ওবজেক্টিভ কোরিলেটিভিটির কথা--নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক স্থাপনার কথা যেখানে ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির চারিপাশের অবস্থাই বলে দেবে চরিত্রের মনোকথা। শিল্পি সাব্জেক্টিভ উৎসারণ থেকে যত সম্ভব দূরে থাকবেন। কিন্তু তার 'লাভ সং অব আলফেড পুফ্রক' থেকে তিনি কি তার নিজের 'আমি'কে বাদ দিতে পেরেছেন? ফ্রুফকের সদা দ্বিধাগ্রস্ততা, বিষণ্নতা তথা আধুনিকতার শূন্যতা কি কবির নিজের নয়? বিশ্ব যুদ্ধের দানবিকতা, পরবর্তীতে চারিদিকে শিল্প নগরি নির্মাণের পর, মানুষের মানবিক অস্তিত্বকে ধুলায় মিটিয়ে দিয়ে তাকে যন্ত্র করার পাঁয়তারার ফলে আধুনিক কবির মনে যে বিশাল শূন্যতা তৈরি হল- সেটি কি তিনি লুকোতে পেরেছেন? তার ওয়েষ্ট ল্যান্ড কি তার সেই সময়কার তার নিজের মনের ও চারিদিকের ধ্বংসস্তুপের ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকা জ্বলন্ত রিয়েলিটি নয়? তাই কবিতা শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি নৈর্ব্যক্তিক থাকে না। কবি-ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ-আচরণ, তার চেতন অবচেতন-- যা তার সামাজিক ও রাষ্ট্রিক তথা বিশ্ব কণ্ডিশনের কাছে নিবেদিত- তাই যেন ধরে রাখে। রবীন্দ্রনাথ এমন একটি কবিতা কি লিখেছেন যেখানে কবির 'আমি' পরোক্ষভাবে হলেও আমাদের চারপাশ, সত্য চারপাশ, তার মূল্য তার দাবী নিয়ে ওঠে আসে নি? । তার প্রেম প্রীতি, দুঃখ, আনন্দবোধ বা সন্তসম ধ্যানে মানুষের শুভবোধকে দেখার চোখ-তার চারিদিকের মানুষজন, সমাজ, প্রকৃতি ও প্রতিদিনের ধুলোবালির গান তার কবি-ব্যক্তিটিকেই বার বার প্রকাশ করে।

আমি এই যে একলা ঘরে একটি জলপোকা হয়ে আরাম করে বসে লিখছি, তার ভেতরে সত্য হয়ত নাই অতটুকু, যেমন পাথর ধরে পাথরেরঅস্তিত্বটুকু আগুনের মতো আঙুলে জ্বলে উঠল, যেমন সকালের সূর্য- সত্য একটি গ্যাসখণ্ড হয়ে আমার রোপকূপে আগুন জ্বালিয়ে ধরল। এসব অভিজ্ঞতা কবিতায় একেবারে নিরেট সত্য হয়ে ধরা দেয় না। তারপরও কবিতার এক একটি পংক্তিতে কি রক্তগন্ধ নাই? নাই আগুনের ভেতর পুড়ে যাওয়া হাড়ের ছাইগন্ধ? নাই কি সূর্যফোটা আর সূর্যগ্রহণের স্মৃতি? নাই কি পৃথিবীর এক অসভ্য মানুষের লোভ আর লালসার

কারণে বাংকারে লুকানো একটি শিশুর প্রথম মৃত্যুরঙ? ঠিকই আছে। খালি চোখে দেখা যায় না এগুলোকে। ওরা আমার এই রক্তমাংসের আমি, আমার মায়ের গর্ভে প্রথম জন্মকলিফোটার স্মৃতি নিয়ে কবিতার 'হয়ে ওঠার' সাথে মিশে থাকে। না হলে তো এটি একটি শব্দ হয়ে ওঠার কৌশল মাত্র, ম্যাজিক বাক্য হয়ে ওঠার চতুর ছল মাত্র। তখন আমার রচনা কি কবিতা হল- এই আমি আমার উপলব্ধির সত্যকে ছাপিয়ে? কবিতার দায়বদ্ধতার মতো ভারি জিনিসটার কথা না তুল্লেও কবির সামাজিক বা ভূ-প্রাকৃতিক নীরব অঙ্গীকারের কারণে কবিতা শেষ পর্যন্ত শুধুই একটি শিল্প হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কবির সৃষ্টিকাজ- কবিতা, তার মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে থাকে সেইসব সম্ভাবনার সূত্রগুলি। কবিকে আমরা শেষ পর্যন্ত যদি মানুষ হিসাবে চিন্তা করে থাকি তাহলে কবির এই অবস্থানগত বসবাসের কারণে, কবিতায় তার রক্তমাংসজাত, তার আত্মগত উচ্চারণগুলি কবিতারশব্দ ধরে, কবিতার ডালপালার নিচে মানুষের জিনের মতো লুকানো অবস্থায় থাকে। কবিতা দিয়ে সমাজ পাল্টানো যায় না, কাউকে দেশপ্রেমিক করাও যায় না, কিন্তুতার ভেতরে জমে থাকা কবির মাটিচাপা খণ্ড খণ্ড আত্মদান দিয়ে, মানুষের মনকে একটি আয়নার কাছে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায়।

২০/০২/২০১৩

ফেসবুক ভিত্তিক কবিতার পাতা 'ঘুমঘোর কবিতার ক্যাফে' এর সাথে আমার একটি সাক্ষাৎকার

১। ঘুমঘোরঃ কবি হয়ে ওঠা কি আপনার মোক্ষ না বাধ্যবাধকতা? কবি না হলে আক্ষেপ হতো? আপনার কবি হয়ে ওঠার ব্যক্তিগত জার্নিটার কথা আমাদের জানান।

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ মোক্ষটাই আসল। আমার কাছে কবিতা একটা যাত্রা। লক্ষ্যে পৌঁছা নয়, সবর্দা যাওয়া। আমার সদা বেঁচে থাকার প্রেরণা, টিকে থাকার উপায়। কী হতো কবিতাছাড়া এই জীবন? ভাবতেই কেমন লাগে! কবিতা লেখার আগে কবিতা-পাঠক হয় মানুষ। তার ভেতরে যদি কবিত্ব থেকে থাকে একটু, তাকে সাথে করেই আগায় সেই কবিতা-পাঠক। এর মানে হয়ত একজন বিশেষ কবিতা-পাঠেকর মধ্যেই একজন ভবিষ্যতের কবি বসে থাকে নীরবে। ঢাকা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পড়ার সময় থেকেই কবিতার সাথে নিবিড় পরিচয়। মূলত সেই সময় থেকেই নিয়মিত কবিতা পড়া, কবিতার বিস্ময়কর ভাষার প্রতি দুর্বলতা বাড়ে। বুঝলাম কবিতার ভাষা ঠিক গল্পের ভাষা বা উপন্যাসের ভাষা নয়। তো সেই যে একটা ভাবনার কথা অন্য রকম করে, অন্য ভাষায় গড়ে তোলা যায়, সেই বিষয়টি সর্ব প্রথমে আমাকে টানল। স্কুলে পড়ার সময় পাঠ্য পুস্তকে কত ধরণের কবিতা পড়েছি, পদ্য পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের ছড়া-কবিতা, নজরুলের বজ্রকণ্ঠের দেশ মাতৃকার কবিতা, আরো কতো কতো মিনিংফুল, নীতি উপদেশমূলক পদ্য। কিন্তু কেমন জানি এগুলো বেশি টানতো না। একদিন পাঠ্যপুস্তকে হঠাৎ করে পাওয়া বুদ্ধদেব বসুর কবিতা 'নদী-স্বপ্ন' এর দুটি লাইন 'কোথায় চলেছো? এদিকে এসো না! দুটো কথা শোনা দিকি এই নাও- এই চকচকে ছোটো, নুতন রূপোর সিকি' পড়ে কেমন জানি লাগল। তারপর বড় হয়ে কলেজের লাইব্রেরীতে বসে জীবনানন্দের 'মহিনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জোৎস্নার প্রান্তরে' অথবা 'তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে' এসব লাইন পড়ে বিব্হল হয়ে পড়লাম। দেখা আর অনুভবের দরোজাটাই যেন খুলে গেল নতুন করে। মনে হল কবিতাও এরকম হয়! এই যে পরাভাষা, বিশেষ করে তার মূর্ত ও বিমূর্তের খেলা, আমাকে বিভোর করে রেখেছিল অনেকদিন। প্রথম থেকেই সরাসরি কমিউনিক্যাটিভ, গাছ, ফুল, নদী, নারী, প্রেম এইসব অতিব্যবহৃত, কবিতাগন্ধী বিষয় নিয়ে লিখতে ইচ্ছা হয়নি। তাছাড়া আমার পারিবারিক আর

অর্থনৈতিক জীবনও আমাকে আমার মতো কবিতা লিখিয়েছে। আমি আমার বাবাকে হারাই খুব অল্প বয়সে। তখন আমার বয়স ছিল পাঁচ বা ছয়। আমরা তখন ১৩ ভাইবোন। ভাইবোনদের সাথে অভাব অনটনে জীবন কেটেছে। শৈশবে এমনও হয়েছে দুপুরের খাবার রাত্রে খেয়েছি, রোযার সময় মসজিদে গিয়ে ইফতার করেছি। কলেজ জীবনটা পায়ে হেঁটে, ইউনিভার্সিটির জীবনটা পায়ে হেঁটে, টেম্পুতে চড়ে আর টিউশনি করে কেটেছে। তাই আমার কবিতা শুরুতেই কিছুটা আত্মজৈবনিক, রক্তাক্ত, ব্যর্থতা ও শূন্যতাবোধ, অস্থির আর অনিদির্ষ্ট জীবনটাকে বোঝার মধ্যে দিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। তাই আমার প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ যথাক্রমে 'শীতমৃত্যু ও জলতরঙ্গ' 'বাল্মীকির মৌনকথন' এ কবি তুষার গায়েনের ভাষায়, কখনো ছায়াপরিবার, কখনো ইতিহাসকে পূর্ণনির্মাণ, কথনো রাজনীতির অন্তসারশূন্যতা, দৈনন্দিন জীবনের টানাপোড়েন- এইসবের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। বলা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে পড়ার সময় আমি কবিতার প্রতি মোটামুটি সিরিয়াসলি ঝুঁকে পড়ি। সেটি ১৯৮৮/৮৯ সালের দিকে হবে। তখন 'একবিংশ'র সম্পাদক ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক কবি খোন্দকার আশরাফ হোসেনের সাথে পরিচয় হয়। তিনি তার পত্রিকায় লিখতে অনুরোধ করেন। সেই তো শুরু।

২। ঘুমঘোরঃ স্বতঃস্ফুর্ততা ও প্রয়াস এই দুয়ের মিথষ্ক্রিয়া বা স্বতন্ত্রভাবে কোনটির ভূমিকা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে কতটুকু বলে আপনি মনে করেন?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ একটি কবিতা কবির সচেতন অংশগ্রহণ ছাড়া লেখা হয় না। সত্য যে প্রাথমিক একটা অনুপ্রেরণা, ভেতরে কিছু একটা হাজির হওয়া বা স্পার্ক করা বা 'নাজিল' হওয়া যাই বলি না কেন এগুলো কাজ করে। কিন্তু এই প্রথম উপলব্ধি, প্রথম কবিতা পাওয়াটাকে ছাড়া তো আর কবিতা লেখা যাবে না। আবার মজার বিষয় হলো প্রথম উপলব্ধিতে পাওয়া কবিতাটা আসলে কখনই লেখা হয় না। সেটিকে অন্য একটি ভাষায়, একটি তৈরি, সামাজিক কেজো ভাষায় লিখতে হয়। এমন করতে গেলে কবিতার প্রথম পাওয়াটা পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই কবিতায় আমরা সবসময় আসল কবিতাটা হারাই। যা থাকে সেটি আর একটি কবিতা। যা হোক, একটা কবিতা কবির ভাবের, চিন্তার স্বতস্ফুর্ততা আর নিমার্ণের যৌথ ফসল। কবিতার স্বতঃস্ফুর্ততা কবিতাটাকে প্রাণ দেয়, কবিতাকে বোধ ও ভাষার আর একটি ভিন্ন অভিজ্ঞতার স্বাদ দেয়। আর কবিতার নিমার্ণ প্রণালী কবিতাকে দেয় একটি শরীর।

৩। ঘুমঘোরঃ ভাস্কর চক্রবর্তী বলতেন, ”আমার একটাই দায় আছে। ভালো কবিতা লেখার দায়। এছাড়া আমার আর কোন দায়িত্ব নেই। “আপনিও কি তা মনে করেন? একটা কবিতা কখন “ভালো কবিতা” হয়ে ওঠে আপনার চোখে?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ ভালো কবিতা বা মন্দ কবিতা বলতে আদৌ কি কিছু আছে? লেখাটি কবিতা হয়ে উঠল কিনা সেটাই দেখার বিষয়। অনেকেই পাঠ্য পুস্তক অথবা কোনো কবিতার ছন্দ বিষয়ক বই-এ লেখা কবিতার অলংকরণ, ফর্ম ইত্যাদিতে তালিম নিয়ে বা পূর্বসুরি কারো কেতাবি ঢঙে লেখা কবিতা দেখে নিজেও কতো সুন্দর, সার্থক কবিতা লেখেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে ঐযে, নতুন চেতনার বিস্ময়, নতুন এক্সপ্রেশন থাকে না বলে এগুলো শুধু কবিতার মতো লেখা কবিতা মনে হয়। সত্য যে এগুলোতে লোক দেখানো একটা চাতুর্যময় মেকিং থাকে। আমি যখন কবিতার মতো বলি তখন তার উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ ও ফর্ম, ধারাবাহিক নির্মাণ ইতিহাস, ঐতিহ্য মেনে একটা প্রতিষ্ঠিত, স্বীকৃত গড়ে ওঠাকে বোঝাই। এগুলো কবিতার মতো লেখা কবিতা। ভাবের কথাকে কবিতার মতো সাজিয়ে ফেললেই তো আর কবিতা হয়ে যায় না। কবিতা ভাব আর ভাষার সমন্বয়, এর মধ্যে না-দেখার বিস্ময়, উপলব্ধির বিস্ময় মিলে যখন একটা প্রসারিত নতুন চেতনার জন্ম দেয় তখনই লেখাটি কবিতা হয়ে ওঠে।

আজ আমরা এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি এখান থেকে আর পেছনে ফিরে যাবার উপায় নাই, দরকারও নাই। একটা সাধারণ কথা মনে আসে- আগে লেখা কবিতার মতো আমি লিখব কেন? বড়জোর এগুলো পাঠ হতে পারে, তার মেকিং তার ভাষা জানা যেতে পারে। কিন্তু তাকে অনুসরণ করে লেখা মানে একটা প্রতিষ্ঠানের কাছে দাসত্ব করা। আমার কাছে মনে হয় এখন বাংলাদেশে কবিতার জগতে একটা দোদূল্যমান, কনফিউজড সময় বয়ে চলছে। দরকার একটা টার্নি পয়েন্ট, দরকার আবার নতুন করে শুরু করা। এর মাঝে কারো কারো কবিতার মধ্যে এই টার্নিং পয়েন্টের শুরু দেখা যাচ্ছে। এটি বড় আশা জাগানিয়া বিষয়।

৪। ঘুমঘোরঃ একজন কবির কবিতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে ব্যক্তি কবিকে জানা কতোটুকু প্রয়োজন? আদৌ প্রয়োজন কি না? নাকি তাঁর সৃষ্টিই তাঁর একমাত্র পরিচায়ক?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়। তবে আমি মনে করি কবিতাকে শুধুমাত্র কবিতার আলোকেই বিচার করা উচিত। অন্ততপক্ষে এই সময়ে। এতে সৃষ্ট শিল্পটির ওপর সুবিচার করা হয়। কারণ কবির ব্যক্তিগত জীবন জানা থাকলে আলোচক/সমালোচক পক্ষপাতিত্ব করতে পারেন। তখন কবিতা নয় কবির নাম, কবির জীবন কবিতা আলোচনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কবির দুর্বল লেখাটাকে আলোচক বেশি ভালো, আবার ভালো লেখাটাকে কম মূল্য দিতে পারেন। যদি শুধু একটি কবিতা পর্যালোচনার জন্য হয়ে থাকে তাহলে কবিতাই মূল পাঠকেন্দ্র হওয়া উচিত। আবার যখন আমরা একজন কবির সামগ্রিক কাব্য-জীবন পর্যালোচনা করতে চাই তাহলে তার জীবন নয় তার কবিতার বিশেষ কিছু ট্রেণ্ড চিহ্নিত করে আলোচনা করি। সেই অর্থে কোনো কোনো সময় কবির ব্যক্তিগত জীবনও কাজে লাগে। যেমন ধরুন আমেরিকার ৬০ দশকের বীট জেনারেশনের কবিদের জীবন আর কবিতা সমান তালে চলেছে। তাই সেই সময় আর কবিদের জীবনটাকে জানা থাকলে কবিতায় আরো বিশদভাবে আলোকপাত করা যায়। আমাদের বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ আর কাজী নজরুল ইসলামের কথা স্মরণ করুন। আমরা দুজনের জীবন আর কাব্য ঝোঁকগুলোর খবর কম বেশি জানি। জীবনানন্দ তার কবিতার মতোই পলায়নপর, নিঃসঙ্গ, সন্দেহপ্রবণ, স্বপ্নচারি, কখনো আত্মহত্যাপ্রবণ। আবার নজরুল তার কবিতার মতোই উল্লাসপ্রবণ, উচ্চকণ্ঠের অধিকারি। সুতরাং এই চারিত্রিক গুণাবলি যেহেতু এই দুজন কবির কবিতার একটা প্যারালাল অবস্থায় থাকে তখন কবিতা বুঝতে আমাদের সুবিধা হয়।

৫। ঘুমঘোরঃ মহাকাল অত্যন্ত নির্মম ব্যক্তি সাহিত্যিকের প্রতি। বায়রন একসময় ছিলেন জনপ্রিয়তম, এখন তিনি অন্য রোম্যান্টিকদের তুলনায় কমই পঠিত হন। আন্যদিকে এমিলি ডিকিনসনের সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো তাঁর জীবদ্দশায়, এখন তাঁকে ছাড়া আমেরিকান সাহিত্য ভাবাই অসম্ভব। মহাকালের বিচারে কে টিকে যান, কেনো টিকে যান বলে আপনার মনে করেন?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ এইটাই তো মহাকালের খেলা। কেন এমন হয়? ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারব না। কারণ মহাকাল নিয়ে ভাবিত নই। তবে আমার কাছে মনে হয় প্রতিভা, মোলিকত্ব, স্বর্ন খনির মতো লুকানো দেখার বিস্ময়, ভাষার গুপ্ত আগুন ইত্যাদি কালজয়ী কবিদের আছে। মানুষ এই সোনা পাওয়ার লোভে বা আগুনে পোড়ার লোভে বার বার এই কবিকে আবিষ্কার করেন। প্রতিভা একটা বড় জিনিস। আপনি অনেক কায়দা কানুন জানতে পারেন, পড়াশোনা

করতে পারেন। কিন্তু ঐযে প্রতিভা না থাকলে আপনি বেশিদূর আগাতে পারবেন না। হয়ত লোক যোগাযোগ, তোষামোদী, প্রচার, পশার এইসব দুই নম্বরী করে আপনার কালে পরিচিতি আদায় করতে পারবেন কিন্তু আপনার কাল গেলেই আপনি শেষ। লেখকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ থাকেন যে তাদের সৃষ্টি ইউনিক। বাইরণকে এখন মানুষ তেমন একটা পড়ে না কারণ কবি বাইরণের আনন্দ-উচ্ছাস, রোমান্টিক স্বপ্নচারিতা বড়ই ফ্লাট, একঘেয়ে। মানুষ চিরদিনই তার সৃষ্টি-রহস্য, পৃথিবীতে তার অবস্থান, অনিকেত একাকিত্ব, রহস্যময় জীবনের কূল কিনারা খুঁজে বেড়ায়। টু বি আর নট বি-র মতো আর কি! কবি বাইরন যাকে কবিতা করতে চেয়েছেন তা সময়ের দাবিমাত্র, তাতে আজানার বিস্ময় নাই। তার রোমান্টিক উচ্ছাসমূলক কবিতার সারবত্তা সময় ফুরোলেই আর মূল্য থাকে না। অথচ তার সমসাময়িক কীটস এখনো স্মরণীয়, পঠনযোগ্য। কবিকে সময়ের বাইরে চিন্তা করতে হয়। অনেক কবি সাহিত্যিক আছেন তাদের বিষয়বস্তু, ভাষার কারণে সমসাময়িককালে তেমন পরিচিত পান না। কারণ তার চিন্তাধারা, তার কবিতার ভাষা তার কাল থেকে অনেক এগিয়ে। তিনি পাঠকের অজান্তেই তার সামনে এক ধরণের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে রাখেন। আম-পাঠক আগের ভাষায় অভ্যস্ত বলে বার বার একই ভাষা দেখতে চান। এমিলি ডিকিনসন নিজ সময়ে জনপ্রিয় বা বহুল পঠিত ছিলেন না কারণ তার কবিতার ভাষা তীব্র ভাবে এলিপ্টিক্যাল(যে ভাষায় শব্দ বা শব্দাবলি গোপন রাখা হয়) ইসেন্ট্রিক ঘূর্ণিভাষা, বা আমাদের সন্ধ্যা ভাষার মতো, আধা প্রকাশিত আধা অপ্রকাশিত । তাকে বোঝার জন্য নতুন দিনের পাঠকের জন্ম নিতে হয়।

৬। ঘুমঘোর: প্রবাস জীবন যেখানে আপনার চারপাশে বাংলা ভাষাবলিয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম, যেখানে আপনার দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে-চিন্তাপ্রক্রিয়ায় অন্য ভাষা ব্যবহার করতে হয়, যেখানে অপরিচিত সংস্কৃতির ভেতর আপনাকে বসবাস করতে হয়ড়তার প্রভাব আপনার কবিতায় কতোটুকু?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ বিদেশ কাজের পরিবেশটুকু বাদ দিলে আমার বাকী সময়টুকুর সঙ্গী আমার বাড়ি, বাংলা ভাষা আর আমার স্মৃতি। তাছাড়া ঘরে সবাই বাঙলায় কথা বলি, একটা বাঙালি পরিবেশ বজায় রাখতে চেষ্টা করি, অনলাইন বাংলা পত্র-পত্রিকা তো আছেই। এগুলো বিরাট সুবিধা। অনলাইন, ই-টেকের কারণে আজ কোনো কিছু আর দূরের মনে হয় না। সবই তো মোটামুটি হাতের মুঠোয়। কিন্তু ঘরের পরিবেশে বাংলা চালিয়ে যাওয়া কতোদিন কাজ করবে এ নিয়ে মাঝে মাঝে সন্দহে হয়। কারণ ছেলেমেয়েরা শুরু করে ভালো, মানে

হাইস্কুলে না ওঠা পর্যন্ত ভালো বাংলা বলতে পারে। কিন্তু ওপরের ক্লাসে যেতে যেতে ধীরে ধীরে তাদের ভোকাবুলারি কমতে থাকে। তাই যে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাচ্ছে তাদের সাথে বাংলা- ইংলিশ মিলিয়ে কথাবার্তা বলতে হয়।

তো ব্যক্তিগতভাবে একটা খালি জায়গা তো সব সময় থেকেই যায়। বেশি মিস করি ঐ সময়টাকে যখন দেশে বাল্যবন্ধুদের সাথে পার্কে বাদাম খেতে খেতে আড্ডা দিতাম। মিস করি বাংলা বইপত্র, ম্যাগাজিন, ফুচকা ওয়ালা, ফুটপাতের চায়ের দোকান আর বলাকা সিনামা হলের সামনের ব্রিজটাকে। একটা জায়গাতে আলাদা একটা ভাষাগত জীবন ব্যবস্থা থাকলে লেখালেখিতে কিছু পরিবর্তন তো আসবেই। আবার ভাষাই তো সবকিছু নয়। আরো কতো কিছু আছে- ফিজিক্যাল, নন-ফিজিক্যাল বস্তু, ধারণা আমার চারপাশে আছে। এই যে একটা স্টেশন দেখলাম একটা পাহাড় দেখলাম এটি তো আমার অতিচেনা জানা কমলাপুর বা ঘোড়াশাল স্টেশন নয়, পাহাড় নয়। তাহলে আমি কী করে দরদ দিয়ে জেনুইনলি অনুধাবন করব? এখানে আসার আগে প্রায় নিউমার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে যেতাম। কোনো আড্ডা না, এমনিতেই। ফুটপাতের বইগুলো স্পর্শ করে দেখতাম। এই যে মাতৃভাষায় একটা জিনিসের সাথে সম্পর্ক করা এটি এখানে হয় না। কেমন জানি শুধু প্রয়োজনের খাতিরে করা। বাঙালিদের আড্ডা আছে, খানাপিনা আছে, গান বাজনা, ওয়াজ মহাফিল আছে। কিন্তু কবি সাহিত্যিকদের কোনো আড্ডা নাই, মানে তেমনভাবে নাই। এখানে আমি আছি, কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ আছে। কিন্তু সময়ের অভাবে আমাদের খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না।

তবে আশার কথা হলো প্রাথমিক একটা ধাক্কা খাওয়ার পর, এক যুগের বেশি এখানে বাস করার পর, আস্তে আস্তে এই মায়াটুকু কাটতে বসেছে। এখানকার সন্ধ্যা, বিকাল, রাত্রি আমার নিজের হতে চলেছে। তা না হলে তো কবিতা লিখতে পারতাম না। স্মৃতি আছে কিন্তু শুধু স্মৃতি দিয়ে তো কবিতা লিখা যায় না। এখন যা দেখছি, পড়ছি, করছি তাই তো কবিতার ভাবনা খোড়াক হয়ে আসছে।

৭। ঘুমঘোর: আপনার কবিতা লেখার শুরু আশির দশকে হলেও আপনি নিজেকে নব্বইয়ের কবি বলে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কিন্তু আপনার সমসাময়িকদের অনেকেই আশির কবি বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। আশির দশককে বাংলা কবিতার প্রকৃত উত্তরণের কালও বলা হয়ে থাকে। এমন এক সময়ের অংশ আপনি নিজেকে ভাবতে না চাওয়ার পেছনে কারণ বলবেন কী?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ আমি আশির দশকের শেষের দিকে খুব সম্ভবত ১৯৮৮-১৯৮৯ সাল থেকে লেখা শুরু করি, এটি সত্য। সব কবিরই একটা প্রস্তুতি পর্ব আছে, ভাষা ও স্টাইল খুঁজে বেড়ানো আছে। আমারও ঐ সময়টা কিছুটা এরকমই। সবাই লেখা ছাপাচ্ছে, আমি বসে থাকব কেন- একরকম ছেলেমানুষি আর কি। তখন একবিংশ আর কয়েকটি দৈনিক পত্রিকায় আমার লেখা বের হয়েছিল। কিন্তু আমি আমার চর্চাকাল শুরু ৯০ দশকেই। আমার ভাষাটাও নব্বই দশকের, আশির দশকের নয়। সৈয়দ তারিক আর সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ আমার সহপাঠি হলেও ওরা দুজনেই আশির দশক থেকেই পরিপূর্ণভাবে কবিতা লেখা শুরু করেছে। তাছাড়া তারিক বয়সে আমার চেয়ে দুই বছর আর সুব্রত প্রায় এক বছরের বড়। যদিও এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়, তবুও এরা আমার কিয়ৎ সিনিয়র!

আশির দশক বাংলাদেশের কবিতার একটি পালাবদলের দশক অবশ্যই, কিন্তু নববইয়ের দশকে কবিতার বিষয়-আশয়, ফর্ম, উপস্থাপনা পুরোপুরি পাল্টে যায়। মনে করুন সেই সময়ে পোস্টমডার্ন সাহিত্য তত্ত্ব তুঙ্গে। কবিতার পূর্বেকার বুনিয়াদ, আধুনিকতার ঘিন ঘিনে অপচয়, ক্লিন্নতা, ক্লিশে কবিতার গায়ে ধাক্কা দিয়ে কবিতার বহুমুখি যাত্রার কাছে দায়বদ্ধ থেকে, হাজার বছরের শিল্পস্নাত ইতিহাস ঐতিহ্যকে পূনর্নির্মাণের মধ্য দিয়ে নব্বইয়ের কবিতা ছুঁয়েছিল জীবনের সবকিছুকেই। প্রতিষ্ঠিত ফর্ম ভাঙা থেকে শুরু করে, কবিতার এক রৈখিকতা ত্যাগ করে বহুরৈখিকতাকে গ্রহণ, মানে কেন্দ্রাতীগ কবিতা, ব্যাকরণ বিরোধীতা এইসব গুণ এই সময়ের কবিদের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। তাই সংগত কারণেই আমি নিজেকে নব্বইয়ের কবি বলে মনে করি।

ঘুমঘোর: একটি অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত আড্ডায় আপনি বলেছিলেন পপুলার মিডিয়াতে হাতে গোনা কয়েকজন কবির নাম ঘুরেফিরে আসে। জনপ্রিয় ও বহুলপ্রচারিত মিডিয়াতে যারা আছেন তারা এই কবিদের পরিচিত, বন্ধু বা সাগরেদ। কিন্তু এটিকে একটি পরিকল্পিত সাহিত্যিক অসততা, বা সাহিত্যিক জেনোসাইড বলে আপনার মনে হয়েছে। এর ফলে পাঠক বাংলাদেশে যে আরো প্রতিভাবান আর শক্তিশালী কবি আছেন তা জানতে পারছেন না। আপনি কেনো এটাকে পরিকল্পিত ভাবছেন? যাদের নাম ঘুরেফিরে আসে তাদের প্রায় সবাই তো শক্তিমান কবি। "জেনোসাইড"-এর মতো শব্দ যেহেতু আপনি এ-প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন, সহজেই বোধগম্য যে এ-ব্যাপারে আপনার তীব্র ক্ষোভ রয়েছে। এর

কারণ কী ব্যাখ্যা করবেন? আর কাদের কবিতার কথা আসে না বলে মনে করেন?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ ক্ষোভ নয়, একে অভিযোগ বলা যায়। আমার মনে হয়েছে যারা এটি করে বা করেছে এটি তাদের আইডেনিটি ক্রাইসিসের ফল। একটা বিরাট হীনম্মন্যতা। আর এটি বেশ ইচ্ছা করেই, পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছে। কারণ এটি যারা করে তারা এইসব কবি লেখকদের গ্রুপেরই মেরুদণ্ডহীন প্রতিভাহীন কবিযশোঃপ্রার্থী। এটি ক্রমশ দুর্বৃত্ততাড়িত আমাদের সমাজের বাইরের কিছু নয় অবশ্য। যেরকমভাবে ক্যাডারভিত্তিক জোট, ট্যাণ্ডারবাজি, দালালি, হল দখল, জোর জবরদস্তির ক্ষমাতায়ন বাংলাদেশে ঘটে- এটিও ঠিক এরকম একটি মাস্তানি আর কি। তখন আমার চিন্তার কারণ হয়েছিল এই কারণে যে এরা মিডিয়া, সাহিত্যগোষ্ঠী বা এরকম গোষ্ঠীচালিত পত্রপত্রিকায় আপাতত একটি নিজস্ব ছায়াদূর্গ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং খুব কায়দা করে একজন আর জনের নাম বলেছে, তালিকা তৈরি করেছে। তাই এদের নামই ঘুরে ফিরে এসেছে। কারণ তাহলেই তো পাঠককে একটা ফাঁকি দেয়া সম্ভব, পাঠক জানবে যে তারাই একমাত্র। তখন আমার কাছে তাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য ভালো যে এখন ইন্টারনেট ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে, অনলাইন পত্র-পত্রিকা, সোস্যাল মিডিয়া, ব্লগ চালু হয়েছে। এখন কোনো গোষ্ঠীরই একচেটিয়া প্রচার আর প্রশারের আর সুযোগ নাই। কবি এখন ইচ্ছা করলে যে কোনো জায়গা থেকে যে কোনো সময়ে কবিতা আপলোড করতে পারেন। পাঠকও তাই। পাঠক আগের চেয়ে আরো বেশি বিচার বিবেচনা বোধ, বুদ্ধি ব্যবহার করে বুঝতে পারছেন কারা কবি আর কারা অকবি। এটি যদিও ডাহা প্রমাণের বিষয় নয়, আর এখন কবিতা-লেখক হিসাবে এসব বলতেও আমার নিজেকে ছোট মনে হয়, তবুও বলেছিলাম কারণ বলার দরকার ছিল। আর একটি কথা বিবেচনার জন্য বলি। বাংলাদেশে কোনো সৎ সমালোচনা সাহিত্যে এখনো গড়ে ওঠে নাই। এটির যেমন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কারণ রয়েছে তেমনি আছে লেখকের ব্যক্তিস্বার্থ, দূরভিসন্ধি। ফলে যখন এই শাখাটি ক্রীয়াশীল থাকে না তখন সাহিত্যে গ্রাম্য মাতব্বরি চলে, জোর জুলুম চলে। আর যাদের নাম আসে নাই, তারা তো এখন সবার সামনেই কবিতার ডালা নিয়ে বসে আছেন। পাঠক, কবি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারছেন কার শক্তি কতটুকু। কেউ নাম উচ্চারণ করল কি করল না হু কেয়ারস!

৯। ঘুমঘোর: এখন আপনার একটি স্বতন্ত্র ও বিশেষ প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি: আপনার কবিতায় সওম, নামায, ক্বাবা, সিজ্বদা, জায়নামাজ, ইত্যাদি ইসলামিক-ফার্সী শব্দের ব্যাবহার অত্যন্ত দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং তা আরোপিত মনে না হয়ে ভাষার স্বাভাবিক ধারার সাথে মিশে যায়। যেখানে দেখা যাচ্ছে সমাসাময়িক কবিরা এসব শব্দ খুব একটা ব্যাবহার করছেন না, বা করলেও খুব দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, সেখানে আপনি অবলীলায় এগুলো ব্যবহার করছেন। এবং করছেন যেহেতু, তাই বলতে পারি এইসব শব্দরাশি নিয়ে আপনার একটা নিজস্ব মতের জায়গা রয়েছে। তা কেমন?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ কবির কনশাসনেস সব সময় এক ধারায় একই টানে বা একই প্রপঞ্চে কাজ করে না। আমার এই শব্দগুলো বিশেষত আমার প্রকাশিতব্য নতুন কবিতার বই ‘সিজদা ও অন্যান্য ইসরা’ তে দেখা যায়। আমি গত দুই এক বছর একই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা ডিভাইন-কনশাসনেস আর আর্থলি-কনশাসনেস এর ভেতর দিয়ে যাওয়া আসা করেছি। আর রাহমানুর রাহিম(ক্ষমাশীল) আর আল মুনতাকিম(শাস্তিদাতা) দুটি পরস্পরবিরোধী স্বরুপ বোঝার চেষ্টা করেছি। এটি একই সময়ে যন্ত্রণা ও আনন্দময় অভিজ্ঞতা। এমন কি মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ার সময় জায়নামাজের দিকে তাকিয়ে অবচেতনে, আমি কবিতায় এই সব মায়াবী আবহে, মায়াবী শব্দে আবাহন করেছি। সৃষ্টিকর্তার এও এক বিশেষ মহিমা! ভেবে ভেবে আর্শ্চয আর মোহিত হয়েছি। একটা কথা মনে রাখতে হবে, যে শব্দ বা শব্দবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো এগুলো আরবি বা ফারসি হলেও এগুলো আমাদের ভাষায় এমনভাবে মিশে আছে যে এগুলো আর বিদেশি শব্দ হিসাবে ধরা যায় না। আমরা কি সংস্কৃত, ইংরেজি, পুর্তগীজ, চীনা ইত্যাদি বিদেশি ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে বাংলা বলি না? কবিতা লিখি না? তখন তো কেউ কিন্ত কোনো আপত্তি করে না! একজন বাঙালি হিন্দু কবি বা বাঙালি সেকুলার কবি যদি ঈশ্বর, দেবতা, পুজা, পুরোহিত, প্রণাম ,মন্দির ইত্যাদি শব্দ অবলীলায় ব্যবহার করতে পারেন তখন একজন মুসলিম বাঙ্গালি কবি, ধর্মীয় কারণে হোক বা মুসলিম সংস্কৃতির কারণেই হোক, এইসব আরবি ও ফার্সি শব্দ ব্যবহার করে কবিতা লিখতে পারবে না কেন? এটির কারণ মনে হয়- আমাদের সাবকনশাস মাইণ্ডে ধরে রাখা বাঙালি সংস্কৃতির একচেটিয়া, অন্ধ আগ্রাসনমূলক প্রভাব। এ বিষয়টি বেশ সাম্প্রদায়িক। আল্লাহ, ইসলাম, মোহাম্মদ, নবী রাসুল, ইমাম, সালাত, সওম ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করলেই কেউ মোল্লা বা মৌলবাদী হয়ে যায় না। একজন কবিকে এই চাপানো ভয় থেকে বের

হয়ে আসতে হবে। আমার এরকম কোনো পক্ষপাতিত্ব বা সমস্যা নাই। আমি সব ধরণেই শব্দই কবিতার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। তবে আসল কথা হলো এগুলো কবিতা হলো কিনা নাকি কোনো ধর্মীয় উপদেশমূলক, হিতবাদী পদ্য হলো এটিই বিবেচ্য।

১০। ঘুমঘোর: "এমন একটা সময় হয়ত যায় সবার জীবনে যেখানে এক রক্তপিপাসু সৃষ্টিডাকাত বর্শা ছুঁড়ে কবিতা লেখায়। কোনোভাবে ফেরানো যায় না তাকে। ১৯৯৭/৯৮ সালের দিকের কথা। তখন একটা ঘোরের মধ্যে সময় কাটছে আমার। ডাক বিভাগে চাকরি করি। মনে যা আসে তা অফিসের টেবিলে প্রথমে লিখে রাখি তারপর দৌড় দিয়ে পাশেররুমে কম্পিউটারে বসে টাইপ করি। ...তখন কবিতার আগুনে পুড়ছি আমি, আমার প্রতি পদক্ষেপে প্রতি শ্বাসে এক একটি কবিতা বাতাস হয়ে উড়ছে, পাখি হয়ে বসছে আমার হাতে।" পলাশী ও পানিপথ কাব্যগ্রন্থের রচনাকালের কথা এগুলো। এই যে সৃষ্টিশীলতার ঘোর, কবিতার অগ্নিতে দহন এর ভেতর কারো পক্ষে সমস্ত জীবন থাকা সম্ভব নয়। আপনার সে সময়কার সাথে এখনকার সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার তুলনা কেমন করে করবেন?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ তখন ৯০ দশকের শেষের দিক। আমার বয়স তখন কতো হবে ২৬/২৭ এরকম। একজন কবির জীবনে এই সময়টা বেশ বেদনাময়, পাগলা করা সৃষ্টিশীল সময়। সে যদি কবি হয়ে থাকে এই সময়টা তাকে জ্বালিয়ে দেবে, পুড়িয়ে দেবে- এটাইতো স্বাভাবিক। আমি তখন কিন্তু জনপ্রিয় বা বিখ্যাত হওয়ার লোভে কবিতা-জীবন শুরু করিনি। এটি ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত কবিতাযাপন, গাছ থেকে পাতা বের হওয়ার মতো অবস্থা। এমন হয়েছে যে আমি অফিসে গিয়েছি শুধু একটা কবিতা লিখতে! 'পলাশি ও পানিপথ' এর কবিতাগুলো সেই সময়েই লেখা। আর তখন একবিংশ বেরিয়েছ, বের হয়েছে নিসর্গ। লেখার তো একটা প্লাটফর্ম ছিলোই।

তারপর আমি ১৯৯৯ সালে মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়া চলে আসি, অভিবাসি হয়ে। এখানে এসে বিরাট একটা কালচারাল শোক খেলাম। নতুন দেশ, নতুন ভূ-প্রকৃতি, নতুন লোকজন। শুধু ভাষাটা নতুন নয় কারণ ভাষাটা তো আমি জানতামই। তার সাথে রুটি রোজগারের জন্য চাকরি বাকরি খোঁজার ঝক্কি ঝামেলা শুরু হলো। তো এই দূরবস্থায় কবিতা এক রকমের পালিয়েই গেল।

চেতনাগতভাবে একটা বিরাট চেঞ্জও এটি। তবুও কিছুটা যুদ্ধ করে করে ২০০৪ সাল পর্যন্ত অনিমিয়ত কবিতা লেখা চালিয়ে গেলাম। তারপর ২০০৪-২০০৯ প্রায় পাঁচ বছর প্রায় কিছুই লিখিনি। কবিতার জগৎ থেকে প্রায় হারিয়ে গেলাম। যা হোক ২০০৯ সালের দিকে এসে ইন্টারনেট, ব্লগ, সোস্যাল মিডিয়া বিশেষত ফেসবুক যখন আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল তখন সমসাময়িক কবিবন্ধুদের কবিতাগত-অনুপ্রেরণায়(কাব্য-হিংসা!)আবারো লেখালেখিতে ফিরে আসি। প্রথমে ভাবলাম আমার আগের লেখার একটা সংকলন বের করি। তো পলাশী ও পানিপথ বের হল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা তাগাদা অনুভব করলাম যে আগের থীম, টপিক, মেকআপ সব পরিত্যাগ করব। যেমন আবহমান বাংলা, ছায়াপরিবার, ইতিহাস, রক্তপাত মানে সরাসরি এগুলো আর লিখব না। এখন যা কিছু লিখব নতুনভাবে লিখব। এটি একটি সচেতনা আর কি, যদিও লেখা এইভাবে হয় না। তবুও আবেগটা টেনে ধরলাম, ভাষাটা আরো একটি শানিয়ে নিলাম। কবিতা আসতে লাগল চেতন আর অবচেতনে, বাস্তবতা আর পরাবাস্তবতার মধ্য দিয়ে। তার সাথে যোগ হলো বিদেশ থাকার অভিজ্ঞতা। জীবনানন্দের মতো -তোমরা তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও- আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব- এরকমভাবনা আর তাড়া করল না। বাস্তবতা হলো আমি বিদেশ আছি। আর এই বিদেশকে আমার দেশ বানাতে প্রায় দশ বছর লাগল। আশ্চর্য এখন ঢাকায় গেলে আমার সিডনির জন্য মন কাঁদে।

১১। ঘুমঘোরঃ 'শীতমৃত্যু ও জলতরঙ্গ' আপনার প্রথম প্রকাশিত কবিতার বই এবং আসছে বইমেলায় বের হতে যাচ্ছে 'ক্রমশ আপেলপাতা বেয়ে'। প্রথম ও শেষ বইয়ের মধ্যে আপনার কবিতায় কি ধরণের বিবর্তন এসেছে?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ এটি বিচারের মালিক তো পাঠক। কিছু পার্থক্য তো থাকবেই। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শীতমৃত্যু ও জলতরঙ্গ'(১৯৯৫) প্রস্তুতি পর্বের লেখা দিয়ে সাজানো। কিন্তু খেয়াল করলে দেখা যাবে আমি একটি ভাষা খুঁজে বেড়াচ্ছি, কিছুটা গুপ্ত, কিছুটা খোলা, মূর্ত ও বিমূর্ত চিত্ররেখার মতো। আর যাকিছু কবিতাগন্ধী তাই পরিত্যাগ করছি। নিজের রাস্তাটাকে ঘুরে ঘুরে আবিষ্কারের পালা যেন। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বাল্মীকির মৌনকথন'(১৯৯৬) এ আরো গভীর ভাব আর বিন্যাসে নিজেকে সঁপে দিয়েছি। একটা ডুব দিয়ে কবিতা-সমুদ্রের গভীরে জলের আনাগোনা টের পাওয়া যেন। কিন্তু আমার তৃতীয় কবিতার বই 'পলাশী ও পানিপথ'(২০০৯) এ আমি কবিতার ভেতর ও বাহির এই উভয় দোলাচালে ঘুরে

বেড়িয়েছি। একদিকে বাংলা ভাষা, ভারতীয় উপমহাদেশ আর বাংলাদেশের মর্মরে থাকা ইতিহাসের রক্তমাখা মুখ, ঐতিহ্য ও রাজনীতির ট্রাজিক ফলাফল আর অন্যদিকে নিজের বিম্বে, কবিতার সদা পলায়নপর, থরো থরো কাঁপা মুখ। এর ধারককে সদা জ্বালিয়ে রেখে উভয় যেন একই সাথে এই বইতে ভাষা পেয়ে উঠল। এটি ছিল আমার কাব্য জীবনের প্রথম পর্ব।

আমার দ্বিতীয় জীবন ও কাব্যচর্চা উভয়ই শুরু হয় অস্ট্রেলিয়াতে এসে। এখানে এসে জীবনযাপন বদলে যাবার কারণে কাব্য-ধারণাও পাল্টাতে শুরু করে। বস্তুকে, তথা জীব জগৎ-কে ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা, পরিধি থেকে বিন্দুর দিকে হাঁটা, স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে সর্ম্পক নিরূপণের যন্দ্রণাদায়ক অবস্থা এবং ভাবনার বহুমুখি বিস্তার, এসব ঘটতে থাকে। আমার মনে হয় এই যে বাস্তবতা-পরাবাস্তবতা, চেতন-অবচেতন, মূর্ত-বিমূর্ত এই দ্বিরাচারি ভ্রমণ আমার জন্মগত। এটি বিস্ময়ের দিক বা ভাবনার গুণ যাই বলি না কেন আমার কবিতার একটি অবিচ্ছেদ্য দিক। এটিকে আমি এড়াতে পারি না। প্রথাবদ্ধ ছন্দ ব্যবহার তো আগেই বাদ দিয়েছিলাম, কিন্তু এবার ধ্বনির সাথে আন্দাজ করা আরো তপোধ্বনি, পূর্ণতা-শূন্যতা, শব্দের শারীরিকতা নয়, অনুভূতি আর বোধের শারীরিকতা ইত্যাদি দিয়ে একটি আন্তর সাংগীতিকতাকে ধরতে চেয়েছি। আমার নতুন কবিতার বই- ক্রমশ আপেলপাতা বেয়ে-তে এই চিহ্নগুলোর খোঁজ মিলবে।

১২। ঘুমঘোরঃ নো ম্যানস জোন পেরিয়ে নামে আপনার একটি কবিতার বই আছে, কবিতার বইয়ের শিরোনাম হিসেবে নো ম্যানস জোন পেরিয়ে শব্দবদ্ধটি বাছাই করতে হলো কেন? কবি কি কোনো অর্থে 'নো ম্যানস জোন'-এর বাসিন্দা বলে আপনার মনে হয়?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ ঐ যে নতুন পরিসর, নতুন ভাষা খোঁজা, অন্য কবিতার সন্ধান ইত্যাদির একটা 'জায়গা' হিসাবে আমি এটি ব্যবহার করতে চেয়েছি। কবির নিজস্ব দেশ কাল সময় এসব তো থাকেই। তারপরও একজন কবি ঐ যে রেড মার্কড, না-যাওয়া এলাকা, যেখানে মানুষ যেতে সাহস পায় না, সেখানে যেতে চায় মানে ফিজিক্যালি নয়, তার কাব্যিচিন্তা দিয়ে। এটি সম্ভব হয় যদি আমি আমার চিন্তার বন্ধাত্ব, প্রয়োজনহীন অলংকরণের দাসত্ব থেকে বেরিয়ে যেতে পারি। সবই একটা প্রতীক আর কি।

১৩। ঘুমঘোরঃ আপনার কবিতায় কনক্রিট ও এবস্ট্রাক্টের এক অদ্ভুত সমন্বয় বিভিন্নভাবে পাওয়া যায়। যেমন, "নদী অভিজ্ঞতা" নামক কবিতায় "নিবিড় পাতাল রক্তে তোমাকে ছোঁবার সাধ মাছ হয়ে জাগে" এখানে এবস্ট্রাক্ট সাধের সাথে কনক্রিট মাছের তুলনা, বা একই কবিতায় "ভাবলে মৃত্যু খুব ঝুলন্ত থাকে শাদামাছে" এবস্ট্রাক্ট মৃত্যুর সাথে আবার মাছেরই তুলনা, যা কনক্রিট। এমন আরো উদাহরণ দেয়া যায় ("বাসবিষয়ক তিনটি" কবিতার "মায়াকামিজের মাংস" শব্দবন্ধ)। এই বিশেষ প্রবণতা নিয়ে আপনার মন্তব্য কী?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ আসলে মূর্ত আর বিমূর্ত বলতে কিছুই নাই। সব কিছুই সময়কে, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে উপলদ্ধি করার ওপর নির্ভরশীল। আমরা চোখে যা দেখছি, অভিজ্ঞতায় যা মেনে নিয়েছি, সেটাইতো সেই বস্তুকে বা ধারণাকে একমাত্রিকভাবে প্রকাশ করে না। সবই তো ইল্যুশন, মায়া। আর সব জিনিসেরই একটা প্রাণ আছে, অস্তিত্ব আছে বলে টের পাওয়া যায়। আমি মনে করি আমরা একটি অনন্ত সময়ে বাস করি। তো এই সময়-আধারে সবকিছু বদলে যায় অহরহ। মানুষের চিন্তা ভাবনা, কামনা বাসনা, জ্ঞান অভিজ্ঞান অহরহ বদলে যায়। সিদ্ধান্ত বদলে যায়। এমন কিছু জিনিস আছে যাতে আমাদের কোনো হাত নাই। আমরা ইচ্ছা করলেও ঠিক একই অবস্থায় ভিন্ন সময়ে চলতে পারি না। এই বিষয়টিকে আমি কবিতায় প্রকাশ করতে চাই। বাস্তব অভিজ্ঞতা আর অনিশ্চিতের মিলে যে একটা আপাত কেওয়্যটিক, কুয়াশা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সেই রকম অনুভূতি দিয়ে আমার কবিতা উপলব্ধ করা যায়। নদী অভিজ্ঞতা কবিতাটির শক্তি হলো ইমেজারি। ৯০ দশকের দিকে টিভিতে এক সুন্দরি মডেলের(খুব সম্ভবত মৌসুমি হবে) ফর্সা পা নদীতে নেমে যেতে দেখেছিলাম। কী অদ্ভুত সুন্দর সাদা পা, পায়ের আঙুল, তার সাথে টল টলে জল- এটাই আমার এই কবিতার ব্যাকগ্রাউণ্ড। মনে হলো মাছ ধরতে নামছে নারী আর পুরুষের প্রেম নদীর ভেতর লুক্কায়িত প্রেমশক্তি, রিরংসা, মাছ হয়ে স্পর্শ করতে চাইছে সুন্দর। এ এক অদ্ভুত এক্সপ্রেশন হয়ত, কিন্তু এটি একটি গভীর ইমেজারির মাধ্যমে পাঠকের সাথে যোগাযোগ করছে। আশ্চর্য, টামাস ট্রান্সট্রোমারের কবিতায় এখন এই গভীর ইমেজারির খোঁজ পাওয়া যায়।

১৪। ঘুমঘোরঃ এইযে ইদানীং দেখি আমরা অনলাইনে কবিদের মধ্যে দু-ধরণের মত। এক পক্ষ প্রথাবদ্ধ ছন্দ মেনে, মাত্রা ঠিক রেখে কবিতাচর্চায় গুরুত্ব দেবার পক্ষে, আর আরেক পক্ষ ছন্দকে খুব বেশি মুল্য দিতে চান না। প্রথাবদ্ধ ছন্দ জানা ও তার প্রয়োগ কতটা জরুরি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে? সমসাময়িক কবিতা

ছন্দের জাল ছিঁড়ে কতোটা বেরিয়ে গেছে এবং ছন্দের পুনর্বাসন কতোটা প্রয়োজন?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ এ বিষয়ে অনেক কথা হয়েছে, তর্ক, এমন কি মনোমালিন্যও হয়েছে। এ পৃথিবীতে ছন্দ ছাড়া কিছুই নাই। পৃথিবীর শুরুতে ছন্দ ছিল, পৃথিবীর শেষও হবে ছন্দে। আমি যে এই কথাগুলো বলছি এখানেও এক ধরণের ছন্দ আছে, ধ্বনির প্রতিঘাতে, বিরতি আর চলা নিয়ে ধাপে ধাপে একটা দোলার সৃষ্টি হচ্ছে। কবিতা যেভাবেই লিখা হোক না কেন, যে ভাষাই ব্যবহার করা হোক না কেন ছন্দ থাকবেই। তবে কেউ কেউ ছন্দ নিয়ে এত ছন্দবাজি করেন যে মনে হয় তারা ছন্দের ইজারা নিয়ে রেখেছেন। 'ছন্দহীনতা' একটি অপপ্রচার মাত্র, যারা প্রথাবদ্ধ ছন্দ ব্যবহার করতে চাইছেন না তাদের ঘায়েল করার কায়দা এটি। আদিতে কবিতা লেখা হত একটা শব্দে শব্দে দোলা বা ছন্দ গাঁথুনি দিয়ে, যাতে করে এটিকে সবাই মনে রাখতে পারে। কারণ তখন কোনো ছাপাখানা ছিল না। মানুষের মুখে মুখে ধরে রাখার জন্য কবিতার লাইন ভেঙ্গে ভেঙ্গে, তাল, লয় মিলিয়ে একটা সাংগীতিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। তাই পৃথিবীর আদি ধর্মগ্রন্থ, আদি কাব্যগুলো ছন্দে ছন্দে বলা। তো আধুনিক যুগ আসার পর, প্রিন্ট ব্যবস্থা আবিষ্কারের পর মানুষের কবিতা আর মনে রাখার প্রয়োজন নাই। বই আকারে এইসব লেখাগুলো মানুষ এখন ইচ্ছা করলেই যখন তখন পড়ে নিতে পারে। কবি আজ আর প্রথাবদ্ধ ছন্দে লেখার জন্য বাধ্য নয় এবং তা জরুরিও নয়। প্রথাবিদ্ধ ছন্দ একটা বদ্ধ প্রতিষ্ঠানের ধারণা দেয় যা সামন্ততান্ত্রিকতা ও দাসত্বকেই মনে করিয়ে দেয়। কবিতা এমন একটি শিল্প যে এটি আপনা আপনিই, শরীরে ছন্দ ধরে রেখে লেখা হয়। কান সজাগ রাখলেই বেশি টের পাওয়া যায়। তাকে আলাদা করে কোনো প্রথাবদ্ধ ছন্দে ধারণ করার কোনো মানে হয় না। তাই প্রথাবদ্ধ ছন্দ জানার মধ্যে একটা কৌশল জানা থাকতে পারে, কিন্তু তাতে কোনো বাহাদুরি নাই। জীবনানন্দ যদি ঢিলা ঢালা অক্ষরবৃত্ত ছন্দ প্রয়োগ ছাড়াও তার কবিতাগুলো লিখত তাহলেও কবিতার কোনো হেরফের হতো না বলে মনে করি। কারণ এগুলি এমন একটি ভাষায় লিখা যে যেখানে ছন্দ সেকেণ্ডারি, তার থট প্রসেস প্রিলিমিনারি। তাই ছন্দ একটি কৌশল মাত্র, প্রয়োজনীয়তা নয়।

১৫। ঘুমঘোরঃ প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কবিদের কবিতা সম্ভবত আপনি পড়ে থাকেন অন্তর্জালে। এখনকারকবিতারনতুন প্রবণতাগুলো কী কী বলে আপনার মনে হয়?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ ঠিক যে আমি নতুন কবিদের কবিতা পড়ি। জীবন্ত কবিতা খুঁজি, তার থেকে অনুপ্রেরণা পাই। হাতের কাছে থাকলে ভালো করেই পড়ি। অনেকের কবিতা বেশ ভালো লাগে। দেখি নতুন ভাষা পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, নতুন কবিতার জন্ম নিচ্ছে। কয়েকজন তরুণ তো বেশ পরিশ্রম করছে, নতুন স্বাদ আর গন্ধের কবিতা লিখছে। এটা ভালো। কারণ কবিতার ভাষা একদিনে সৃষ্টি হয় না, তার পেছনে লেগে থাকতে হয়। নীরবে, নিভৃতে চর্চা করতে হয়। অনেকেই আছেন একটা গ্রুপ বা এরকম নির্ভশীল ছায়ায় থেকে অথবা সোস্যাল মিডিয়ায় সরব থেকে সময় নষ্ট করছেন। এটি সোস্যাল মিডিয়ার একটি খারাপ দিক। কবিদের এতো সরব, এতো প্রচারমুখো, প্রগলভ হলে হবে না। আবার এও দেখি কেউ কেউ রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র ছন্দে বা গানে গানে কবিতা ভাবে, কবিতা লিখতে চায়। আশ্চর্য লাগে। অনেককেই দেখছি পূর্বের প্রতিষ্ঠানের কাছে মাথা নত করে তাদেরই মতো লিখতে চেষ্টা করে। এটির মানে হলো চিন্তা ও কবিতার দৈন্যতা। যাই হোক, প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের কবিতা পড়ে আমার মূলত দুটো ধারার কথা মনে হয়- একটি হলো কবিতাধারার কবিতা মানে পুরনো ধারার কবিতা আর একটি হলো নতুন ধারার কবিতা। এখনো মোটা দাগের কোনো প্রবণতা চোখে পড়েনি। আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আবার দেখি নব্বইয়ের দশকের কবিতায় যে চিহ্নগুলো ছিল, ঐগুলোই তো ঘুরে ফিরে আসছে। তবে একটা জিনিস বেশ ভালো যে প্রায় সবাই প্রথাবদ্ধ ছন্দে আর কবিতা লিখছে না। আরো ভালো লাগে যখন দেখি মেয়ে-কবিরাও সমান তালে ছেলে-কবিদের সাথে এগিয়ে আসছে, কবিতা, গদ্য লিখছে, পত্রিকা/পেজ সম্পাদনা করছে। এটি খুবই আশার কথা।

১৬। ঘুমঘোর: প্রতিটি নতুন উচ্চারণের মধ্য দিয়েই হাজার বছরের ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস কথা বলে। কোনো কবিই নন প্রভাবমুক্ত সচেতনভাবে বা অচেতনে কবি তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে ঋণী। যদি জিজ্ঞেস করা হয় কারা আপনাকে প্রভাবিত করেছেন, আপনি কাদের নাম বলবেন?

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহঃ তা তো ঠিকই। আমি ব্যক্তিগতভাবে, পৃথিবী নামক পাঠশালাতে থাকা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় লেখা কবিতার উত্তরাধিকারকে সম্মান জানাই। কোনো কিছুই এমনিতেই গড়ে ওঠে না। কবিতার সাথে দীর্ঘদিনের পরিচয়, পাঠ বা থাকা একটা বিরাট প্রাপ্তি হিসাবে কাজ করে। আমার বেলায় তো ব্যতিক্রম নয়। কতো কবির কবিতার স্বাদ গ্রহণ করেছি। কেউ নির্দিষ্ট

করে প্রভাবিত করে নাই। একটা সামগ্রিক পাঠ-অভ্যাসের ফলাফল প্রস্তুতি পর্বের কবিতাগুলো। বাংলাদেশের জীবনানন্দ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল হাসান, পশ্চিমের এমিলি ডিকিনসন, পাউল সেলান, টেড হিউজ, হার্ট ক্রেন, নেরুদা, টমাস ট্রান্সট্রোমার, আরবিভাষী কবি অ্যাডোনিস এর প্রথাবিরোধী স্টাইল, মাহমুদ দারবিশের স্বদেশ হারানোর শূন্যতাবোধ, ফার্সি ভাষার কবি জালাল উদ্দিন রুমির সুফি ভাব ধারার কবিতা আর সর্বশেষ জেন কবিতার সাত্ত্বিকতা, ছোট ছোট অনুভূতির সহজ কিন্তু গভীর এক্সপ্রেশন আমাকে বিস্ময়ে ভরে দিয়েছে। পুরনো কবি হোক, নতুন কবি হোক একটা জীবন্ত কবিতা আরো কতো কবিতার জন্ম দিতে পারে তা ভেবে বেশ আনন্দিত হই, শিহরিত হই।

২৫/১১/২০১৪